অন্তর্ঘাত

(রাজনৈতিক উপন্যাস)

আবুল হোসেন খোকন

[দুটি কথা:
সত্তর দশক– বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সামরিক শাসনের পটভূমিকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক উপন্যাস অন্তর্ঘাত-এর অবতারণা। তবে, সঙ্গত কারণেই উপন্যাসের পুরো অংশ এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব হলো না। সার-সংক্ষেপ আকারে তুলে ধরা হলেও উপন্যাসের ধারাবাহিকতা এবং মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। আশা করি, এ জন্য পাঠকদের সমস্যায় পড়তে হবে না।

বিনীত- লেখক]

(এক)

শরীরে একফোটা শক্তি নেই। বুকটা হাঁপরের মতো উঠানামা করছে। হাত-পা কাঁপছে রি রি করে। দেহটাকে কোন রকমে বিনু এলিয়ে দিলো। পড়ে রইলো লাশের মতো।

গাঢ় অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবতঃ এটা কোন জঙ্গল বা পাটক্ষেত হতে পারে। মরার মতো শুয়ে পড়েছে বিনু। চোখটা খুলে উপরের দিকে তাকালো। আকাশে তারাও দেখা যাচ্ছে না। গাছের আঁড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে হয়তো। রাত কতো হবে এখন? দুইটা? কিংবা তিনটা সাড়ে তিনটা হতে পারে। কারণ মিলিটারি কনভয় থেকে ও যখন লাফিয়ে পড়েছিল, তার ঘণ্টা খানেক আগে দেড়টা মতো বাজছিল। একজন অফিসারকে বলতে শুনেছিল। সুতরাং লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে আসার পর আধ ঘণ্টা কেটে গেছে বৈকী।

বিনুকে গ্রেফতারের পর মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে খানিকটা টর্চারের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। জানতে চাওয়া হয় আরসব সঙ্গীরা কোথায়, ওদের অস্ত্র-শস্ত্রগুলো কোথায়? বিনু এসবের সন্ধান দিতে রাজী হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই ওকে নিয়ে আসা হচ্ছিলো। মিলিটারি কনভয়ের মাঝখানে বসিয়ে চারদিক দিয়ে ঘিরে ছিল সৈন্যরা। তাদের হাতে চকচক করছিলো আধুনিক সব অস্ত্র-শস্ত্র। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চলার পর লাফিয়ে পড়েছে ও। হাতে হাতকড়া পড়ানো ছিল। কিন্তু কায়দা করে মুক্ত হয়েছিল। সৈন্যরা টের পায়নি। তারপর সুযোগ বুঝে অন্ধকারে লাফিয়ে পড়েছে। পড়েই প্রাণপণে ছুটেছে। অবশ্য গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। সৈন্যদের সাব মেশিনগান গর্জেও উঠেছিল। কিন্তু ভাগ্য ভাল একটা গুলিও লাগেনি। আঁশপাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে গেছে গুলি।

ঠাঁ ঠাঁ ঠাঁ ঠাঁ। আবার গর্জে উঠলো সাব মেশিনগান। চমকে উঠলো বিনু। এক মুহূর্ত মতো কেটে গেল ঝিমমারা অবস্থায়। প্রাণপণে দৌঁড়ানোর আগে সবকিছু একবার বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেলো। সৈন্যরা কি ঘিরে ফেলেছে? ওর অবস্থান জেনে ফেলেছে? নাকি আন্দাজে গুলি চালিয়েছে? সামনের দিক দিয়ে কিছু ছুটে গেল। সৈন্য? না, সৈন্য হবে না। ওদের দৌঁড়ানোর শব্দ অন্যরকম। আবার কি যেন ছুটে গেল। বিট্‌কেলে গন্ধ ছড়িয়ে আরেকটা কিছু পালিয়ে গেল। বিনু নিশ্চিত হলো, শিয়াল-টিয়াল হবে। সৈন্যরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসছে। সার্চ করছে জঙ্গল। কতোদূর আছে ওরা? গুলির শব্দটা বেশ দূর থেকেই এসেছে। অন্তত: আধা মাইল দূরে তো হবেই। তারমানে পিছু ধাওয়া করে আসছে ওরা।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো বিনু। বন্ করে মাথাটা ঘুরে উঠলো। পায়ে প্রচণ্ড ব্যাথা। সম্ভবত: দৌঁড়ানোর সময় মচকে গেছে। শরীরের এখানে-ওখানে দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে। জঙ্গলের আঘাতে কেটেছিঁড়ে গেছে হয়তো। দাঁড়াতে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে যাবার অবস্থা হলো। শরীর কাঁপছে। বুকের ধুপ্ ধুপ্ শব্দ এতো জোরে হচ্ছে যে, মনে হচ্ছে আশপাশ থেকেও শোনা যাবে। আতঙ্ক পেয়ে বসেছে বিনুকে। সৈন্যরা এসে পড়লো নাতো? ধরা পড়লে নির্ঘাৎ গুলি করে হত্যা করবে। কতোজনকে ওরা এভাবে হত্যা করেছে, তার ঠিক নেই। ভাগ্য ভাল বলে ও এখনও বেঁচে আছে। আর দেরী করা ঠিক হবে না। সৈন্যরা মরিয়া হয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে।

ঘন অন্ধকারে চোখটা বেশ সয়ে গেছে। তাছাড়া জোনাকির আলোও কাজ দিচ্ছে, এতোক্ষণ খেয়াল করেনি ও। এগুতে শুরু করলো বিনু। ঘন জঙ্গল। তবে শুকনো গাছপালাই বেশি। হাঁটতেই মচমচ শব্দ হয়। পায়ে ক্রেপসোলের জুতো আছে। কিন্তু শক্ত মাটির জমির ভেতর দিয়ে দৌঁড়াতে গিয়ে ফেঁটে গেছে। একেবারে লোহার মতো ওইসব জমির চাঁই। তাছাড়া কেটে ফেলা পাটগাছের গোড়া এবং কাঁটার আঘাতে জুতোর তলা মনে হয় আস্ত নেই। ডাল-পালার আঘাতেও পা কেটেকুটে রক্ত ঝরছে। জায়গাগুলোতে দগদগে ব্যাথা। তবু কোন রকমে সাবধানে পা ফেলে বিনু এগুলো। কিছুদূর যাবার পর

বুঝতে পারলো এটা একটা গোরস্থান। গ্রামের গোরস্থানগুলো এরকমই হয়ে থাকে। বাঁধানো কবর থাকে না।

কবরস্থান ছাড়িয়ে আসার পর বড় বড় পাটক্ষেতের মধ্যে ঢুকলো ও। আকাশে এখন অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারটা পুরোপুরি সয়ে এসেছে। দেখতে পাচ্ছে বিনু। সারি সারি পাটের গাছ আর গাছ। খুব সাবধানে গাছের ভেতর দিয়ে শরীর ঢোকাতে থাকলো ও। কারণ জোরে চলতে গেলে গাছ নড়াচড়া করবে, আশে পাশে সৈন্যরা থাকলে টের পেয়ে যাবে। তাই খুব সাবধানে যেতে হবে। কোনক্রমেই ধরা পড়া চলবে না।

একটু দাঁড়ালো। কোন্ দিকে, কোথায় যাবে– তা ঠিক করে নেওয়া দরকার। দিক ভুল হলে ফাঁদে আটকা পড়া বিচিত্র নয়। সুতরাং ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। ভাবনার প্রথম বিষয় হলো, অন্ততঃ মাইল খানেক চলে এসেছে ও। সৈন্যরা সংখ্যায় শ'খানেকেরও বেশি হবে। তাই অন্ধকারে ওরা এতোদূর আসতে পারবে না। তাছাড়া ওদের সার্চ করতে হচ্ছে। ফলে বিনু ওদের থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে। এভাবে এগুতে থাকলে ক্রমেই দূরে সরে আসতে পারবে। তবে সমস্য হলো যে, এই জায়গাটা সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই। সৈন্যরা তাদের ক্যাম্প থেকে আরও সৈন্য আনিয়ে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলতে পারে। তাই পালানোর পথ সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। অথচ সেটাই নেই। অবশ্য, এই রাতে ক্যাম্প থেকে আরও সৈন্য আসবে বলে মনে হয় না। তবে, দিনের বেলায় যে কম্বিং অপারেশন চালাবে– তা নিশ্চিত। সুতরাং ভোর হবার আগেই নিরাপদে সরে যেতে হবে। কোথায়, কোন্দিকে যাবে–ঠিক করতে পারা যাচ্ছে না। ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিলো বিনু। সামনের দিকে এগুতে থাকলো।

(দুই)

পূব আকাশটা ক্রমেই ফর্সা হচ্ছে। ভুতুরে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। পরিস্কার হয়ে উঠছে প্রকৃতি। সেইসঙ্গে এক অপূর্ব শিহরণ জাগিয়ে তুলছে হালকা বাতাস।

আরেকটু পরিস্কার ভাব আসতেই প্রকৃতির দুয়ার উন্মুক্ত হলো। যতোদূর চোখ যায় শুধু ফসলের ক্ষেত। পাট, ধান, আখসহ নানান জাতের ফসল। মৃদুমন্দ বাতাসে এসবের মাথাগুলো দোল খাচ্ছে। কিচির মিচির শব্দ তুলে পাখিরা পাখা মেলছে আকাশে। উজ্জ্বল আলো না থাকায় ওগুলোর রং দেখাচ্ছে কালো। এখনও চকচকে শুকতারা নিভে যায়নি, তবে পূব আকাশ রাঙা হলেই নিভে যাবে।

মাঝারী সাইজের পাটক্ষেতের আইল দিয়ে এগিয়ে চলেছে বিনু। এ পর্যন্ত সৈন্যদের দেখা মেলেনি। তবে অনেক দূরে পিছনের দিক থেকে মাঝে মাঝে মেশিনগান এবং রাইফেল গর্জে ওঠার শব্দ শুনেছে। ওপর দিয়ে কয়েকটা বুলেটও ছুটে গেছে শিস কেটে। এতে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ওগুলো ফাঁকা গুলি ছিল। কাওকে টার্গেট করে চালানো হয়নি। বেশ অনেকক্ষণ আর শব্দ শোনা যাচ্ছে না। হয়তো ওরা অনেক পিছনে পড়ে গেছে, অথবা আশা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। কম করে ৫/৬ মাইল তো হেঁটেছেই বিনু। সেদিক থেকে এখন নিজেকে অনেকটাই নিরাপদ মনে করা যেতে পারে। অবশ্য সৈন্যরা যদি কম্বিং অপারেশন চালানোর জন্য গোটা এলাকা জুড়ে অভিযান চালায়, তাহলে ভিন্ন কথা।

কয়েকটি নালা এবং আখক্ষেত পেরিয়ে বিনু যখন একটি বড় আকারের গাছতলায় থামলো, তখন সূর্য উঠতে যাচ্ছে। দূরে বাড়ি-ঘর স্পষ্ট দেখা যায়। কৃষকেরা গরু-লাঙ্গল নিয়ে বেরুচ্ছে। শিশু-কিশোররা দাঁতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ঘুরছে। বিনু এখন কি করবে? সামনের গ্রামে ঢুকবে কি?

না ঢুকে উপায়ও নেই। কারণ ক্ষুধায় নাড়ি-ভূরি জ্বলে যাচ্ছে। খেয়েছে সেই আগের দিন সন্ধ্যা রাতে। তারপর যতো ধকল গেছে তাতে করে পেটে সামান্য দানা-পানিও নেই। অবশ্য হেঁটে আসার সময় ডোবা

থেকে আজলা ভড়ে পানি পান করেছিল। তাও এখন শেষ হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। সেখান থেকে প্রচুর রক্ত ঝড়েছে। ওষুধ না লাগালে গ্যাংগ্রিন ধরে যেতে পারে। কিন্তু গ্রামে ঢোকা অথবা কারও মুখোমুখি হওয়া উচিত হবে কিনা– সেটাই বড় প্রশ্ন। বিনুর রক্তাক্ত এবং বিদ্ধস্ত অবস্থা দেখে অপরিচিত গ্রামের লোকজন নানান কিছু সন্দেহ করতে পারে। তাছাড়া ইতিমধ্যেই মিলিটারি বা তাদের সাদা পোশাকধারী লোকেরা ছড়িয়ে পড়েনি–তাইবা কে বলবে? যদি তারা নাও এসে থাকে, তবু লোকজনের মুখোমুখি হলে ওর খবর পৌঁছে যেতে দেরী হবে না। সেক্ষেত্রে পূণরায় ধরা পড়তে হবে। সুতরাং গ্রামে প্রবেশ করা বা কোন মানুষের মুখোমুখি হওয়া মোটেও নিরাপদ হবে না। আরেকটি রাতের জন্য অপেক্ষা করাই যুক্তি সঙ্গত, তখন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু, অতোক্ষণ টিকে থাকবে কি করে বিনু? ক্ষুধার্ত এবং ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে টিকে থাকা অসম্ভব। তার চেয়েও বড় কথা ওর জানা প্রয়োজন, এই এলাকার নাম কি? ও কোথায় আছে? এটা জানার ওপরই নির্ভর করছে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার পথ বের করা। এজন্য গ্রামের কারও না কারও সঙ্গে কথা বলা দরকার। কোন্টা করা উচিত ঠিক করতে পারছে না বিনু।

(তিন)

দু'সপ্তাহ পরের কথা। বিনু এখন নৌকায়। নদী পার হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে বকুল। বয়সে ছোট। দু'জনের কাছেই নিরাপত্তার জন্য রয়েছে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র। বিনুরটা পয়েন্ট ৩৭ ক্যালিবারের চাইনিজ পিস্তল, বকুলেরটা পয়েন্ট ৩২ ক্যালিবারের আমেরিকান রিভলবার। ওদের পরনে সাধারণ শার্ট আর লুঙ্গি। পায়ে 'অক্ষয় কোম্পানির' চটি জুতা। এটাই গ্রামাঞ্চলের মুটামুটি স্বাভাবিক পোশাক। তবে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের মানুষ শার্ট পড়ে না, চটি ছাড়া খালি পায়ে হাঁটে। বিনু আর বকুলের পোশাকে অস্বাভাবিকতা নেই। চেহারা দেখে অবশ্য বোঝা যায় ওরা অশিক্ষিত নয়।

সাবধানে ফাঁকাফাঁকি বসেছে দু'জন। নৌকায় আরও ক'জন যাত্রী। তবে সবাই মহিলা, একজন শুধু পুরুষ। কৃষক পরিবারের লোক। ওপারে নিশ্চয়ই কোন কাজে গিয়েছিল। বিনুদের ওরা চেনে না। নৌকার মাঝিও পরিচিত নয়। লগির খোঁচায় নৌকা প্রায় ঘাটে চলে এসেছে। বিনু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলো। সন্দেজনক কেও আছে কিনা দেখলো। অবশ্য ঘাট ফাঁকা। এটা উল্লেখযোগ্য কোন ঘাট নয়। এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য গ্রামের মধ্যে একটা অপ্রচলিত ঘাট। কাজেই বিনু সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলো না।

নৌকা ভিঁড়লো। পাঁচ পয়সা করে ভাড়া দিয়ে একে একে সবাই নামলো। বিনুরাও নেমে এলো। নামার সময় মাঝি জিজ্ঞেস করলো,'ক-নে যাবেন মিঁ-ভাইরা?' 'ওই সামনে'– জবাব দিয়ে নেমে এলো বিনুরা। এক প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিলে আরেকটা প্রশ্ন করবে, গ্রামের সাধারণ নিয়ম এটা। সুতরাং বেশি না বলে এড়িয়ে যেতে হলো ওদের।

ঘাট থেকে বেশ খানিকটা উপরে উঠতে হয় নদীর ঢাল বেয়ে। তারপর মোটামুটি সমতল। আসলে এটা একটা ছোট বাজার। হাঁটের মতো সপ্তাহে বাজার বসে। আজ বসেনি। তাই লোকজনও নেই। বিনুদের তবুও তীক্ষ্ণভাবে খেয়াল করতে হলো– কেও অ্যাম্বুশ করেছে কিনা। কারণ পদে পদে শত্রু আর বিপদ। একটু অসাবধান হলেই আঘাত আসবে। তখন হয় মৃত্যু নয় গ্রেফতার। এই অসতর্কতার জন্য অনেককেই বিপদে পড়তে হয়েছে। বিনু তাই সজাগ।

পেটের ভিতরে ক্ষুধা জানান দিয়ে উঠেছে। এরকম জীবনে ক্ষুধা হলো নিত্য সঙ্গী। বকুলকে জিজ্ঞেস করলো, 'ক্ষুধা লেগেছে বকুল?' 'তেমনভাবে লাগেনি এখনও। সবেতো সকাল ১০টার মতো'– লজ্জা পেয়ে জবাব দিলো বকুল।

- 'এক কাজ করি। বাজারের কোন দোকান থেকে পাউন্ডরুটি কিনে নিয়ে আসা যাক। পথে কোথাও গিয়ে খেয়ে নেবো। টাকা আছে?'
- 'জ্বি বিনু ভাই, বারো টাকার মতো আছে।'
- 'ঠিক আছে। ওই সামনের দোকান থেকে দুটো পাউন্ড রুটি আর খাগড়াই জাতীয় (গুড়ের তৈরি স্থানীয় মিঠাই বিশেষ) কিছু পেলে নেবে। না পেলে কলা নিতে পারো। এক প্যাকেট বিঁড়িও নেবে। যাও। আমি নজর রাখছি।' বিনুর নির্দেশ পেয়ে দোকানের দিকে গেল বকুল। তারপর বিস্কিট আর কলা নিয়ে ফিরে এলো–
- 'বিনু ভাই, রুটি নাই। বিস্কিট পেলাম।'
- 'ঠিক আছে ওতেই চলবে। চলো এখন।'

বিনুর কথা মতো হাঁটতে শুরু করলো। সামনে বিস্তৃত ফসলের মাঠ। আঁইলের মাঝদিয়ে চলছে ওরা। সামনে বিনু পিছনে বকুল। বিনু একটা বিঁড়ি ধরিয়েছে।

প্রায় মাইল খানেক হাঁটলো ওরা। পথে বিস্কিট আর কলা খেয়েছে। সামনেই একটা মেটো পথ। চলে গেছে আঁকাবাঁকা। পাটক্ষেতটা পেরুলেই পথ। ওটায় উঠবে ওরা। এবারের জনপদ আর অপরিচিত নয়। অনেকেই চেনে বিনুদের।

পথটাকে সামনে রেখে নিজেদের অস্ত্রগুলো জায়গা মতো ভাল করে গুঁজে নিলো। সবাই এধরণের অস্ত্র ডান বা বাম হাতের নিচের দিকে হোলস্টারে রাখে। হোলস্টার না হলে ফুলপ্যান্টের পকেটে থাকে। কিন্তু বিনুদের নিয়ম অন্যরকম। ওরা ওগুলো রেখেছে পিছন দিকে লুঙ্গিতে গুঁজে। নিচে আন্ডারপ্যান্ট পরা আছে। আরও আছে মোটা চামড়ার বেল্ট। গুঁজে রাখা অস্ত্রগুলো তাতে শক্ত হয়ে আটকে আছে।

বিনুরা যখন মেটো পথটাতে উঠে এলো, তার আগ দিয়ে ভাল করে দেখে নিয়েছে ভেঁদো (পুলিশ) বা ভেঁদোর দালাল জাতীয় কেও আছে কিনা। থাকার সম্ভাবনা নেই। থাকলে আগেই সতর্ক সংকেত পেয়ে যেতো। কারণ এলাকাটা বিনুদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ফসলী জমিন থেকে উঁচু এই মেটো পথটা ধরে খানিকটা এগুতেই একটা বাড়ি। তার সামনে মুদিখানা। বিনুরা মুদিখানার সামনে আসতেই হইহই করে বেরিয়ে এলো দোকানদার। সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লো বিনুর বুকে–

- 'অনেক দিন পর দেখা বিনু ভাই। কেমন আছেন? সব খবর ভাল তো?' একেবারে এতোগুলো প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একজন মুরুব্বি। পিছনে কয়েকজন যুবক। মুরুব্বির পুত্র সবাই। বিনুদের সঙ্গে ওরাও বুকে বুক মেলালো। এরপর আশেপাশের বাড়ি থেকে আরও যুবক-তরুণ-কিশোর বেরিয়ে এলো। সবশেষে শিশুর দল ছুটে এলো। ওদের মধ্যে কেও বিনুদের সঙ্গে মোলাকাত করলো, কেও হাত মেলালো, আর পিচ্চিগুলো সোজা কোলে উঠে পড়লো। সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে গেল বিনু আর বকুল।

সবাই শান্ত হবার পর বিনু বললো, 'এখন কারও সঙ্গে কথা বলবো না। বসবোও না, জরুরি কাজ আছে। পরে এসে কথা বলবো।' গ্রামবাসীরা বিনুদের স্বভাব জানে। তাই কেও কোন আপত্ত্বি করলো না। ছোটরা শুধু বললো, 'কবে আসবেন বিনুদা?'

- 'আসবো। এলেই দেখতে পাবে'– জবাব দিলো বিনু। তারপর বিদায় নিয়ে পথ ধরে এগুতে থাকলো। গ্রামবাসীরা গভীর আন্তরিকতায় পথ চেয়ে রইলো।

বিনুরা গ্রামবাসীর কবল থেকে ছাড়া পেলো না। যতোদূর যেতে থাকলো, আশপাশের বাড়ি-ঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে অভিনন্দন জানাতে থাকলো ওদের। যেন মহাপুরুষ এগিয়ে চলেছেন গ্রামকে ধন্য করে।

ঘণ্টা খানেক পর। ওরা এসে থামলো এক পাকা দালানের কাছে। ইউনিয়ন পরিষদের অফিস। সাদা দেয়ালে শোভা পাচ্ছে দুটো চাররঙা পোস্টার। দুটোতেই রয়েছে সামরিক পোশাক পরা জেনারেল জিয়াউর রহমানের ছবি। একটা পোস্টারে লেখা, 'বে-আইনী অস্ত্রধারীরা দেশের শত্রু। ওদের ধরিয়ে দিন।' আরেকটায় লেখা, 'আমি সৈনিক। আমি রাজনীতি বুঝিনা। দেশের পরিস্থিতি স্বভাবিক হলেই আমি ব্যারাকে ফিরে যাবো ঃ জেনারেল জিয়া।'

ক্রুদ্ধ চোখে পোস্টার দুটোর দিকে তাকালো বিনু আর বকুল। তারপর দালানটাকে পাশ কাটিয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল। সামনেই একটি দো-চালা ঘর। সোজা ভিতরে ঢুকে পড়লো ওরা। এক বৃদ্ধা বারান্দায় বসেছিলেন। তিনি বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর সম্বিত ফিরে পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর ছুটে এলেন বিনুর দিকে। একেবারে জড়িয়ে ধরলেন ওকে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাল আছো বাবা?' বিনু ততোক্ষণে বৃদ্ধার বুকের ভিতর একাকার হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর একগাল হেঁসে বিনু বললো, 'কেমন আছেন খালাম্মা?' তখনও বিনু আর বকুলের মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছেন খালাম্মা। নিজেকে সংযত করে এরপর বললেন, 'ভাল আছি বাবা। আসো বাবা, ভিতরে আসো। বউমা, ও বউমা, দেখো কারা এসেছে।' খালাম্মা ওদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই লম্বা ঘোমটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এলো সুন্দর মেয়েটি। বিনুদের দেখে ঘোমটা পড়ে গেল। খুঁশিতে ডগমগ করে উঠলো তার মুখ। বললো, 'ওমা! বিনু ভাই! এতোদিন পরে মনে পড়লো বুঝি?'

'আগে বসতে দাও বউমা। হাত-মুখ ধোবার পানি দাও। আরাম করে বসতে দাও। তারপর কথা বলো। কতোদূর থেকেই না আসলো বাছারা। মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে। তুমি বউমা আগেই কথা শুরু করে দিয়েছো।' খালাম্মা কৃত্রিম রাগ করলেন। বিনু বললো, ব্যস্ত হতে হবে না। আমরা ঠিকই আছি।' আবার ধমকে উঠলেন খালাম্মা, 'তোমরা চুপ করো বাপু! পথে পথে ঘুরে কী অবস্থা হয়েছে– তোমরা তো তা দেখতে পাবে না! বউমা তাড়াতাড়ি করো তো। ওই বাড়ির ছোরাটাকে ডাকো। মুরগি দুইটা ধরতে বলো।' বউমা হাঁসতে হাঁসতে ওদের দু'জনকে ঘরে নিয়ে গেল। তারপর হাতমুখ ধোবার জন্য এক বালতি পানি রাখলো কুয়োর ধারে। খুঁটির সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলো একটি নতুন গামছা।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে খাবার আয়োজন হলো। মাছ-মুরগি মিলিয়ে দারুণ উপাদেয় খাবার। বউমা তালপাখার বাতাস করছে, আর খাবার তুলে দিচ্ছেন খালা। খাদক হলো বিনু আর বকুল। খেতে খেতে কথা হচ্ছিল টুকিটাকি। খালা জানতে চাইছিলেন, আর কতোদিন বিনুদেরকে পথে পথে ঘুরতে হবে? বিনু জানিয়েছে, খুব বেশিদিন নয়। শীঘ্রই নতুন দিন আসবে। বকুল জানতে চেয়েছিল, সালাম ভাইয়ের কোন খবর আছে কিনা? সালাম হলো খালার পুত্র এবং বউমার স্বামী। সামরিক বাহিনীতে চাকরী করেন। প্রশ্নের জবাবে বউমা বলেছে, একদিনের জন্য এসেছিল। খুব আতঙ্কিত এবং বিমর্ষ মনে হয়েছে। বেশি কথা বলেনি। শুধু বলেছে, বিনু ভাইরা যেন সাবধানে থাকে। পরিস্থিতি খুব খারাপ। চেষ্টা করছে তাড়াতাড়ি চাকরী ছেড়ে দিতে। কথায় কথায় খালা বিনুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা, তুমি নাকি ধরা পড়েছিলে?' জবাবে ও বলেছে, 'হ্যাঁ পড়েছিলাম। কিন্তু অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি।' খালা ভয় পেলেন। হাঁ-হুতাশ করে বললেন, 'খুব সাবধানে থেকো বাবা, খবরদার আর যেন অসাবধান না হও।'

এক সময় খালা জিজ্ঞেস করলেন, এখন ওদের পরিকল্পনা কি? একগাল হেসে বিনু জানায়, আছে পরিকল্পনা আছে। এখানে বেশিক্ষণ থাকবে না। খাওয়া শেষ হলেই চলে যাবে।

খালা আর বউমা বারবার বললেন, আজকের দিনটা না হয় বিশ্রাম নিক ওরা। কিন্তু বিনুরা নাকচ করে দিলো সেই প্রস্তাব।

(চার)

জোনাব আলী তেমন একটা লেখা-পড়া জানে না। ছোট বেলায় প্রাইমারি পর্যন্ত পড়েছিল। তাও পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেনি। এখন জোনাব আলী নিজের কিছু জমিতে চাষবাস করে। বাগানের তরিতরকারি হাট-বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়। সংসার বলতে স্ত্রী আর তিন ছেলে-মেয়ে। পৈত্রিক ভিটায় চার-চালা টিনের দু'টি ঘর নিয়েই বসবাস। আজ আবার বউ-ছেলে-মেয়েরা নেই। ওরা গেছে মালঞ্চি। ওটা আফিজার বাপের বাড়ি। অনেক দিন পর গেছে, তাই থাকবে কিছুদিন। বাড়িতে একা জোনাব আলী। জমির কাজ সেরে লাঙ্গল-জোয়াল তুলে রেখে, হাঁড়িতে দু'টো চাল দিয়ে ভাত ফুটিয়ে সন্ধ্যা-সন্ধ্যায়ই খেয়ে নিয়েছে বেচারা। তারপর আরাম করে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়েছিল।

গ্রামের এক কোণায় বাড়ি। আশ-পাশের প্রতিবেশিরা বেশ দূরে। ফাঁকাফাঁকা জায়গায় বাড়িটা বেশ সুনসান। দক্ষিণা বাতাসে মন-প্রাণ উজার হয়ে যায়। ইচ্ছে করলে জানালা-দরজা খুলেই ঘুমাতে পারতো। চোরের কোন উপদ্রব নেই। কিন্তু ভয় ভয় করে। একা থাকার এই এক দোষ। মনে হয় জ্বিন-পরী, ভুত-পেত্নী হঠাৎ হামলা করে বসবে। যদিও জোনাব আলী ওসবে বিশ্বাস করে না। তবু একা থাকতে গেলে নানান ভয় চেপে বসে। জানালা-দরজা তাই ভাল করে বন্ধ করে তারপর ঘুমিয়েছিল। আশেপাশের কয়েক বাড়িতে পোষা কুকুর আছে। ওরাই গোটা এলাকা পাহাড়া দেয়। কাজেই ভয়ের কিছু নেই। মোটামুটি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল জোনাব আলী।

ঘুমটা যখন সবচেয়ে বেশি জাঁকিয়ে বসেছিল তখন গভীর রাত। আসলে তখন ছিল রাতের শেষ প্রহর। চারদিকে এমন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল যে, বাতাসের একটানা শোঁ-শাঁ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দেরই অস্তিত্ব ছিল না।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল জোনাব আলীর। কীসের যেন শব্দ হচ্ছে! কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে। লাফিয়ে উঠে বসলো জোনাব আলী। মনে হলো বাড়ির পাশ দিয়ে ভয়াবহ কিছু যাচ্ছে। একটা দুইটা নয়, অনেক। ঝটপট, ধুপধাপ শব্দ আসছে। মচ মচ শব্দ হচ্ছে মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো ডাল-পালা বা লতা-পাতায়। ঝপাৎ করে শব্দ হলো। ভেঙে পড়লো কিছু। মনে হয় জোনাব আলীর বাগানী জমির ঘেরটা ভেঙেছে। ওটার পাশ দিয়ে আইল চলে গেছে। ওদিক দিয়ে কি কিছু যাচ্ছে? কিন্তু অতো ভারী আর তীক্ষ্ণ শব্দ হচ্ছে কেন? অতো সময় নিয়েই বা হচ্ছে কেন? কী যাচ্ছে? মনে হলো যেন হাতির পাল ছুটে চলেছে। ধরাশ্ করে শব্দ হলো। আবার কিছু উল্টে গেল। কুকুরের ডাক দূরে সরে যাচ্ছে। ওরা যেন ভয় পেয়েছে! পালাচ্ছে? শিউরে উঠলো জোনাব আলী। শব্দগুলো বাড়ির চারদিকে হচ্ছে। ক্রমেই বাড়ছে।

আতঙ্কে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল জোনাব। কিছুক্ষণ পর ধাতস্থ হলো। এখনও আগের মতোই অবিরাম শব্দ হচ্ছে। আস্তে করে চৌকি থেকে নামলো সে। জানালার কাছে ফুটোয় চোখ রাখলো। অন্ধকার। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। তারপর তীব্র আতঙ্কের সঙ্গে দেখতে পেল, যুদ্ধাস্ত্র হাতে সারি সারি লোক যাচ্ছে সামনের গ্রামের দিকে। মিলিটারি? কিন্তু তা কী করে হয়! মিলিটারি তো দেশে একবারই নেমেছিল, সেই পাঁচ বছর আগে ১৯৭১ সালে। তখন পাকিস্তানি মিলিটারিরা এভাবে রাতের বেলায় গ্রামে গ্রামে হানা দিয়েছিল। কিন্তু এখন? এখন মিলিটারি আসবে কোত্থেকে! ভাল করে লক্ষ্য করলো জোনাব

আলী। না, কোন ভুল নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সামরিক পোশাক এবং সামরিক হেলমেট মাথায় যুদ্ধের সাজে সারি সারি মিলিটারি প্রায় ডবল মার্চ করে যাচ্ছে। চোখ রগড়ালো জোনাব আলী। এটা কী করে সম্ভব? ওকি সত্যিই এসব দেখছে? শরীরে চিমটি কাটলো। ব্যাথায় লাফিয়ে উঠলো। না, কোন সন্দেহ নেই। এটা স্বপ্ন নয়, রীতিমতো বাস্তব। তাহলে কি রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানিরা আবার এদেশে ঢুকে পড়েছে? দেশ দখল করে নিয়েছে? সব্বোনাশ! আবার দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল? আতঙ্কে হতভম্ব হয়ে গেল জোনাব আলী। তারপর ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়লো।

# # # # # # # # #

সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিল মিতুল। ঠান্ডা, গাঢ় এক রকম মিষ্টি বাতাস। চারদিকে খোলা অবারিত সবুজ বনভূমির মাঝে একটা মাঠের মতো। ফাঁকা। বাতাসের দোলায় লতা-পাতা দুলছে। তারই মধ্যে মিতুল এবং একটা ছেলে। হাত ধরে হাঁটছে দু'জন। হিমেল বাতাস ওদের চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। ছেলেটিকে কোনদিন দেখেনি মিতুল। তবুও পরম বিশ্বাসে হাতে হাত রেখেছে। এতো ভাল লাগছে মিতুলের, যা কোনদিন হয়নি। মনে হচ্ছে ছেলেটা কোন রাজপুত্র, আর মিতুল রাজকন্যা। পৃথিবীতে ওরা দু'জন ছাড়া যেন আর কেও নেই। ওরা যেন অপ্রতিরোধ্য, দূরন্ত দুর্বার। দু'জন ইচ্ছে করলে বাতাসে উড়তে পারছে। ছোট ছোট গাছ-পালার ওপর দিয়ে ঠিক পাখির মতো ভাসতে পারছে। একটু লজ্জা লজ্জা করছে মিতুলের। তবু শক্ত করে হাত ধরে রেখেছে ও, যেন ছুটে না যায়। ছুটে গেলেই যেন সব হারিয়ে যাবে। এতো সুন্দর ঘটনা হারাতে চায় না। ছেলেটার মুখ ভাল করে দেখা হয়নি। একটা ছোট্ট টিলার পাশ দিয়ে যাবার সময় মুখের দিকে তাকালো মিতুল। ছেলেটি হাসলো। শিহরিত হলো মিতুল। মনে হলো কতো আপনার এই রাজপুত্র। এ রাজপুত্র শুধুমাত্র মিতুলে জন্যই।

হঠাৎ কি হতেই হাত ছুটে গেল। ভয় পেয়ে তাকাতেই দেখতে পেল, ছেলেটা পিছিয়ে যাচ্ছে। অদৃশ্য কোন শক্তির টানে যেন এগুতে পারছে না। ওকে ধরার জন্য দৌঁড়ানোর চেষ্টা করলো মিতুল। কিন্তু পা দুটো যেন অবশ হয়ে গেছে। কিছুতেই দৌঁড়াতে পারলো না। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করলো। একটু নড়াতে পারলো। কিন্তু এগুতে পারছে না। পা এতো ভারী হলো কেন! ওদিকে রাজপুত্র ছেলেটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে! উঠে দাঁড়াচ্ছে টলতে টলতে। মিতুলের দিকে হাত বাড়ালো। এগিয়ে আসতে চাইলো। মিতুলও হাত বাড়ালো। এগিয়ে আসতে চাইলো। হাত বাড়িয়ে মিতুলও সামনে যেতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। এবার যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। প্রাণপণে মিতুল দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। দেখতে পেলো সামনে বিরাট একটা কূপ। রাজপুত্র না দেখে এগিয়ে আসছে। চিৎকার করতে চাইলো মিতুল। কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুলো না। আতঙ্কিত চোখে শুধু দেখলো, ছেলেটি কূপের ভিতর পড়ে গেল। মিতুল দেখলো পানিতে ডুবে যাচ্ছে রাজপুত্র ছেলেটি। লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো মিতুল। তখনই ঘুম ভেঙে গেল। হকচকিয়ে উঠে বসলো এবং খেয়াল করলো হাঁপাচ্ছে ও।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর গ্রামে এসেছে মিতুল। এটা ওর দাদুর বাড়ি। বেড়ানো শেষ হলে আবার শহরে ফিরতে হবে। তখন পরীক্ষার ফলাফলের জন্য টেনশনে থাকতে হবে। তারপর একদিন ফল বেরুবে। পাশও করবে ও। কারণ ভাল পরীক্ষা দিয়েছে। যাইহোক, সামনে নানান ঝামেলা। ভর্তি হওয়ার ঝামেলা, ভর্তির প্রস্তুতি নেয়ার ঝামেলা, আরও কতো কি। সুতরাং সব ঝামেলার আগে মনের আনন্দে নেচে-গেয়ে খোলা প্রান্তরে ঘুরে বেরানোর স্বাদটাকে পেতে চায় ও। তাই টুটুলকে নিয়ে চলে এসেছে দাদুর বাড়ি।

দাদুর বাড়িটা বিশাল। তাঁর পূর্ব পুরুষ জমিদার ছিলেন। এখনও তাই রয়ে গেছে বিশাল সম্পত্তি। আম, কাঠাল, লিচু, নারিকেল, তাল, খেজুরসহ হরেক রকম ফল-মূলের বাগানে ভর্তি বিস্তীর্ণ এলাকা

নিয়ে বাড়ি। এ বাড়িতে দাদু-দিদা আর এক চাচা ছাড়া কেও নেই। সুবিশাল এই বাগান বাড়ি অদ্ভুত ফাঁকা ফাঁকা। বাগানগুলো জোংলা গাছে পরিপূর্ণ। গাছে গাছে পাকা ফল থক থক করে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই বাগানের ভেতর দিয়ে যখন বেড়ানো হয়, তখন মনে হয় এটা কোন বন। কারণ গাছে গাছে কিচির মিচির করে পাখি। ডাকে ঘুঘু, কোকিল। বাগানে আরেকটা মজার জায়গা আছে বেশ দূরে, একেবারে শেষ প্রান্তে। এই জায়গাটা গেছো ফুলে ভর্তি। অনেক জাতের ফুলগাছের মধ্যে বকুল ফুল মিতুলে খুব প্রিয়। প্রতিদিন খুব ভোরে যখন শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ও আসে, তখন সাদা চাদরের মতো জমিনে ওপর ছড়িয়ে থাকা বকুল ফুলের মৌ মৌ গন্ধে প্রাণ ভড়ে যায়। ভেজা ভেজা ফুলগুলো দু'হাতে তুলে ডালি বোঝাই করতে অদ্ভুৎ মজা।

মিতুলের পাশের খাটে ঘুমিয়েছে টুটুল। মিতুল-টুটুল পিঠেপিঠি ভাই-বোন। তাই সব সময় ওদের খুনশুটি লেগেই থাকে। দাদুর বাড়িতে ওদের হয়েছে দারুণ মজা। সারাদিন হইচই আনন্দ-ফুর্তি। যে ঘরটাতে মিতুলরা রয়েছে, সেটা অনেক বড়। ওরা দু'জন ছাড়া আর কেও নেই এ ঘরে। পাশের একটি ঘরে দাদু আছেন এবং বিপরীত দিকের আরেকটি ঘরে চাচা-চাচী আর তাদের দুই পিচ্চি সন্তানেরা থাকে। এই গ্রামটা খুব ভাল। কোন চুরি-ডাকাতি নেই। তাই বিশাল জানালাগুলো খুলেই ঘুমিয়েছিল মিতুল আর টুটুল। জানালা দিয়ে হিমেল বাতাস ঢুকছে হু হু করে। জ্যোৎসনায় ভাসিয়ে রেখেছে ওদের খাট।

কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকার পর স্বপ্নের রেশটা কেটে গেল মিতুলের। বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে ঘড়িটা বের করে আনলো। সাড়ে চারটা। তারমানে আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভোর হয়ে যাবে। আবার ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। এইটুকু সময় বরং বসেই কাটিয়ে দেয়া যাক। বসে বসে কল্পনা করতে বড্ড ভাল লাগে। তার ওপর জোয়ারের মতো বাতাস যেভাবে সব উড়িয়ে নিতে চাইছে, তাতে ভাল লাগার মাত্রাটা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। ঠান্ডা বাতাস মিতুলের চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছে বারবার। হাঁটু গুটিয়ে থুঁতনী ঠেকালো ও। হাত দুটো জড়িয়ে থাকলো পা। এভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে জ্যোৎসনায় প্রকৃতি দেখতে থাকলো। জ্যোৎসনা মাঝে মাঝে হালকা মেঘের আবরণে ঢেকে যাচ্ছে। তখন আরও অদ্ভুৎ মনে হচ্ছে প্রকৃতিকে।

জ্যোৎসনার আবেশটা ক্রমেই থিতিয়ে আসতে লাগলো। ভোর হচ্ছে। গায়ের চাদরটা নামিয়ে খাট থেকে নামলো মিতুল। মেঝেয় খানিক পাঁয়চারি করলো। টুটুলটা এখনও ঘুমাচ্ছে। চাদর-টাদর ফেলে দিয়ে একেবারে এলোমেলো হয়ে আছে। ওর অভ্যাসটাই ওরকম। গুছিয়ে শুতে পারে না।

টুটুলের কাছে বসলো মিতুল। ভাল করে তাকালো ওর দিকে। খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বেশ আয়েশ করে ঘুমুচ্ছে বেচারা। ডাকতে ইচ্ছে করছে না। অথচ ভোর হতে যাচ্ছে, বাইরে বের হতে হবে। শিশির ভেঁজা ঘাঁসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে। যা স্বাস্থ্যের জন্য বড়ই উপকারী। অবশ্য মিতুল বা টুটুলের স্বাস্থ্য খারাপ নয়। বরং ওদের সুন্দর দৈহিক গরণ, বিশেষ করে অদ্ভুৎ সুন্দর চেহারা দেখে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও হতভম্ব হয়ে পড়বেন।

টুটুল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে। মনে হয় স্বপ্ন দেখছে। মিতুল আস্তে করে টুটুলের বাহুতে হাত রাখলো। খুব নরম করে নাড়া দিলো। ঘুমন্ত মানুষকে কখনও জোরে করে ধাক্কা দিতে নেই। আদর করে ঘুম ভাঙাতে হয়। তাহলে নার্ভের স্বাভাবিকতা থাকে। এই দর্শন কোন এক অভিজ্ঞ মানুষের। এটাকে সাংঘাতিকভাবে মেনে চলে মিতুল।

টুটুলের বাহুতে মিতুলের স্পর্শ পড়তেই স্বপ্নিল হাসিটা নিভে গেল। একটু যেন কেঁপেও উঠলো। কিন্তু ঘুম ভাঙলো না। হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে নাড়া দিলো মিতুল। ডাকলো, 'টুল, এই টুল। ওঠ।' টুটুল কাঁৎ হয়ে ছিল। কোন শব্দ না করে চিৎ হলো। 'টুল, এই টুল, ওঠ, উঠবি না?'– আবার ডাকলো মিতুল। কোন জবাব দিলো না ছেলেটা।

ওর বুকে হাত রাখলো মিতুল। বড় আদরের ভাই এটা। মিতুলের মনে হয় এটা ওর জান-প্রাণ। যখন ছোট ছিল, তখন একেবারে বুকে করে রাখতো ওকে। এই তো কিছুদিন আগেও মিতুল আর টুটুল এক বিছানায় ঘুমাতো।। কিন্তু ও এখন বড় হয়ে যাচ্ছে। তাই আলাদা হয়েছে। যখন আরও বড় হবে, তখন? তখন কি আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে দু' ভাই-বোন? প্রকৃতির অদ্ভুৎ নিয়ম। ওটাই স্বাভাবিক। এই তো সেই ছোট্ট টুটুলের দেহে এখন ক্রমেই এক রকম রোশনাই দেখা দিয়েছে। পেশীগুলো মজবুত হচ্ছে। শরীরটা কী দারুণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। মুখে গোঁফের রেখাও ফুটছে। একদিন এমন হবে– যখন টুটুল আর এ টুটুল থাকবে না। দাড়ি-গোঁফে পরিপূর্ণ এক যুবক হয়ে উঠবে। তখন কি মিতুলের পক্ষে ঘনিষ্ট হওয়া সম্ভব হবে? হবে না। মিতুলও আরও বড় হবে। তখন হয়তো টুটুলের চাইতে বেশি আকর্ষণ ঘটাবে কোন অপরিচিত যুবকের। সে-ই তখন মন-প্রাণ জুড়ে বসবে। একদিন ঘরও বাঁধবে। আজকের দু'ভাই-বোন কতো দূরে না চলে যাবে। টুটুলও বিয়ে করে সংসারী হবে। কতো পরিবর্তন ঘটবে। পরিবর্তনটাই স্বাভাবিক নিয়ম। যতো বড় হওয়া যায়, ততো পরিবর্তন ঘটে। যে বাবা-মা কতো আদর করে বড় করেছেন, তাঁরাও একদিন পর হয়ে যাবেন। টুটুলের মতো যে ভাই মিতুল ছাড়া কিছু বোঝে না, সেই টুটুলই একদিন এমন হবে যে– নিজের স্বার্থটাকে বড় করে দেখবে। সম্পত্তির ভাগা-ভাগির প্রশ্ন যখন আসে, তখন এই জিনিসগুলোকে স্পষ্ট করে দেখা যায়। নাহ্, ভাবতে ভাল লাগছে না। হাত বুলাতে বুলাতে ডাকলো মিতুল, 'অ্যাই টুটুল, টুটু, ওঠ্। ওঠ্ না আলসে ছোড়া কোথাকার।'

মিতুলের হাতটাকে বুকে চেপে ধরলো টুটুল। এক চোখ সামান্য ফাঁক করে বললো, 'সকাল তো হয়নি। ডাকছিস কেন? ঘুমুতে দে।' হ্যাঁচকা টান দিলো ও মিতুলের হাত ধরে। টুটুল বললো, 'শুয়ে পড়তো এখানে, আয় শো।' হাত ছাড়িয়ে নিলো মিতুল, 'পাজি ছোঁড়া কোথাকার। ওঠ্।' কাধে এক ধাক্কা দিলো মিতুল। দেড় ইঞ্চি লম্বা জিভ বের করে দেখালো টুটুল। তারপর বালিশ থেকে মাথা তুলে মিতুলের কোলের ওপর রাখলো এবং এক হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরলো। বললো, 'মাথায় হাত বুলিয়ে দে না লক্ষী বোন আমার। একটু ঘুমাই।'

মিতুল আপত্তি করলো না। ওর মাথা ভর্তি নরম চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। টুটুল আয়েশে ঘুমিয়ে পড়লো। মনে মনে বললো মিতুল, 'দাঁড়া, তোকে বিয়ে দিয়ে দেবো। তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়ার লোক হবে তখন।' বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দু'ভাই-বোনে মজার মজার তর্ক হয়। মিতুল যখন বলে, 'শোন্‌রে টুটু, শিগগির তোর লাল টুকটুকে বউ আসবে। তোর বিয়ে হবে, হি হি।' জবাবে টুটুল জিভ দেখিয়ে বলে, 'ইস্ লাল টুকটুকে বউ! তুই যদি আমার বোন না হতি, তাহলে তোকেই বিয়ে করতাম। তোর মতো লাল টুকটুক সুন্দরী দুনিয়ায় আর আছে নাকি?' এসব বলে টুটুল যখন চুকচুক করে আফসোস করে তখন মিতুল চোখ পাকিয়ে তাকায়। বলে, 'অ্যাই পাজি ছোকড়া, খুব পাকামো শিখেছিস না? কান ছিঁড়ে দেবো।' টুটুল তখন জিভ দেখিয়ে পালায়।

ভোরের ফর্সা ভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। টুটুলের মাথাটা বালিশে নামিয়ে দিতে দিতে মিতুল বললো, 'তোমার কি ওঠার ইচ্ছে আছে? উঠলে ওঠো, না হলে আমি চললাম।' মিতুল রেগে গেলে টুটুলকে তুমি করে বলে। হঠাৎ টলতে টলতে উঠে বসলো টুটুল। গলা জড়িয়ে ধরলো মিতুলের। ঘাড়ের ওপর মাথা এলিয়ে দিলো। তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, 'ভালো লাগছে নারে আপু। ঘুব ঘুম পাচ্ছে।' মিতুল গম্ভীর হয়ে রইলো। ব্যাপারটা ঘুমের ঘোরেও বুঝতে পারলো টুটুল। চোখ খুলে মিতুলের দিকে সোজাভাবে তাকালো। মিষ্টি করে হাসলো। দু'হাতে মিতুলের মাথাটাকে ধরে নিজের দিকে টেনে আনলো। তারপর চপাচপ তিন/চারটে চুমো খেয়ে বললো, 'লক্ষী আপু আমার। আজকের মতো তুই একাই যা। আমার খুউব ঘুমুতে ইচ্ছে করছে। কাল ঠিক যাবো। তোর আগে আমি উঠবো। এই তোকে ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি।' আরেকটি চুমু খেয়ে বললো টুটুল, 'বল্ আপু, রাগ করিস্‌নি?' হেসে ফেললো মিতুর। বললো, 'ঠিক আছে তুই ঘুমো।' 'থ্যাঙ্কু মাই ডিয়ার আপু'– বলেই বালিশে এলিয়ে পড়লো টুটুল।

মিতুল বিছানা থেকে নামলো। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখলো বেশ ফর্সা ফর্সা ভাব হয়ে এসেছে। আনন্দে নেচে উঠলো মন। বাইরে বেরুনোর জন্য প্রস্তুত হলো। স্কার্ট পড়ে নিলো ও। ওড়না-টোড়না দরকার আছে বলে মনে করলো না। ভোরের বাতাসে যতো কম পোশাকে বেড়ানো যায়, ততোই আরাম। স্যান্ডেলও নেবে না ও। কারণ স্যান্ডেল পায়ে বেরুলে শিশিরে ভেজা মাটি আর ঘাঁসের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ানোর আনন্দটাই শেষ হয়ে যাবে। জানালা দিয়ে বাইরেটা আরেকবার দেখে নিলো। তারপর বেরুনোর আগে খাটের কাছে দাঁড়ালো। ঘুমন্ত টুটুলকে ভাল করে দেখলো। ঝুকে দুটো চুমু খেলো। একটি কপালে, একটি ঠোঁটে। টুটুল জবাবে মিষ্টি করে হাসলো। মিতুল বললো, 'থাক্ যাই।'

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো ও। অন্ধকার ভাবটা থাকলেও আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। কখন যেন বাতাসটা পড়ে গেছে। তাই কুয়াশার আবরণ নেমে এসেছে। মিতুল স্কার্টের নিচের অংশটা খানিক উঁচু করে নরম নরম শিশির ভেজা ঘাঁসের মধ্যে নেমে এলো। কোন দিকে না তাকিয়ে ছুটলো বকুলতলার দিকে। বেশ দূর হাঁটতে হয়। তাই ঘাঁসের শিশিরে পায়ের দিকটা একাকার হয়ে গেল। ওই অবস্থায় ছড়িয়ে থাকা বকুল ফুলের আস্তরণের কাছে এসে থামলো।

একটু চমকে উঠলো। এই জায়গাটায় অন্য কারো আসার কথা নয়। এমনিতেই ফাঁকা জায়গা। বাগানের অন্যান্য দিকে কোন বাড়ি-ঘর নেই। শুধু ফসলের ক্ষেত। কিন্তু বকুলতলার মাটিতে কিছু যেন হেঁটে গেছে। বড় বড় জুতোর মতো অনেক দাগ। একেবারে গর্ত হয়ে বসে গেছে। দাগগুলো স্পষ্ট, যা এখনই হেঁটে যাবার প্রমাণ তুলে ধরছে। গর্তের ভেতরে সাদা সাদা বকুল ফুলের স্তুপ বসে গেছে। ভয় পেয়ে সামনের দিকে তাকালো মিতুল। চমকে উঠলো আবার। হতভম্বের মতো দেখলো অস্ত্র হাতে কালো কালো একদল মানুষ চলে যাচ্ছে। তাদের কাঠামোগুলো কুয়াশায় আবছা ভাবে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ে দাঁড়ালো মিতুল। দৌড় দিলো বাড়ির দিকে।

কিন্তু পথ আগলে দাঁড়ালো ভয়ঙ্কর দর্শন এক মিলিটারি। হাতের মেশিনগান তাক করা মিতুলে বুক বরাবর। একজন নয়, কয়েকজন মিলিটারি ঘিরে ফেলেছে ওকে। মেশিনগান তাক করে রাখা মিলিটারিটি চাপা গলায় বললো, 'বানচোৎ, এখানে কি হচ্ছে? দৌড়াচ্ছিলি কেন?' স্তম্ভিত হয়ে গেল মিতুল। আতঙ্কে গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। পা দুটো হয়ে গেল পাথরের মতো শক্ত, আর ভারী। ঠিক স্বপ্নে দেখা সেই অবস্থার মতো। চেষ্টা করেও নড়তে পারলো না মিতুল। কোন শব্দও করতে পারলো না। মিলিটারিটা ধমকে উঠলো। কিন্তু মিতুল পাথর, হতভম্ব। টলছে ও, এখনই পড়ে যাবে। মিলিটারিরা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলো। ওদের দৃষ্টিতে চকচক করে উঠলো লালসা।

ঠিক তখনই সম্বিত ফিরে পেলো মিতুল। চিৎকার দেয়ার জন্য মুখ খুললো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেও একজন মুখ চেপে ধরলো। অন্য কেও একজন হাতকাটা স্কার্টের ওপরের অংশ ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো। একটানে জামাটা ছিঁড়ে দেহ থেকে চলে গেল। বেরিয়ে পড়লো নিরাভরণ দেহ। আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিলো। ওকে ঠেলে নিলো পাশেই উপ্‌ড়ে কাঁত্ হয়ে পড়ে থাকা একটা বড় আম গাছের দিকে। ঠিক তখনই একজন ওর পরণের নিচের অংশটায় হ্যাঁচকা টান দিলো। ওটাও ছিঁড়ে মিলিটারির হাতে চলে গেল। ওকে চিৎ করে ফেলে দিলো আম গাছের গুড়িতে। কোন শব্দ করার সুযোগ পেলো না মিতুল। নড়াচড়াও করতে পারলো না।..................

মিতুল। খানিক আগেও মেয়েটির কাছে এই প্রকৃতি বড় সুন্দর ছিল। সুন্দর ছিল অরণ্যে ঘেরা বাগান, ঘাঁস, পাখি, শিশির, বকুল ফুল। বড় ভাল ছিল পৃথিবী আর সব মানুষ। ওর একটা স্বপ্নের জগৎ ছিল। প্রাণের চেয়েও প্রিয় একটা ভাই ছিল। ছিল বাবা-মা, আত্মীয় আর বন্ধু-বান্ধব। হয়তো ওর ভালবাসারও

কেও ছিল। তাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল। সুন্দর একটা ভবিষ্যতের কল্পনা ছিল। কিন্তু এক লহমায় সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নিষ্ঠুর বাস্তবতা মিতুলের সবকিছু চুরমার করে দিলো।

****

আবার সেই দোকান। এখানেই ক'দিন আগে এসেছিল বিনু আর বকুল। দোকানদারের নাম আনিস উদ্দিন। সবাই ডাকে আনিস দোকানদার বলে। শক্ত কড়াঘাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল আনিসের। অনেক রাত পর্যন্ত বেচা-কেনা করে দোকানেই ঘুমিয়েছিল। ভেবেছিল বেশ বেলা করে ঘুমুবে। কিন্তু ক্রেতাদের অত্যাচারে পারা যায় না। সকাল না হতেই ডাকাডাকি শুরু করে। আবার শব্দ করে কড়াঘাত হলো। একেবারে বেয়ারা কড়াঘাত। একটু গলা চরিয়ে আনিস বললো, 'কিডা?' কেও উত্তর দিলো না। বরং আগের চেয়েও বাজে এবং ধাপ্ ধাপ্ করে দরজায় ধাক্কালো কেও। 'কিডা ডাকে?'– রাগত স্বরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠে বসলো আনিস। তারপর দরজা খুলতে লাগলো।

আবার ঘটঘট শব্দে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে দরজার ডালাটা খুলে দিলো। হা হয়ে গেল আনিস। ওর দিকে লকলক করে তাকিয়ে আছে বেয়োনেট লাগানো একটা যুদ্ধাস্ত্র। ওটা ধরে রেখেছে দড়ি পেঁচানো হেলমেটধারী কিম্ভুতকিমাকার এক রক্তচোখা মিলিটারি। সঙ্গে আরও কয়েকজন। ওরা এমনভাবে আনিসের দিকে চেয়ে আছে যেন মিটিমিটি হেঁসে বলছে, 'বাছা পালিয়ে যাবে কোথায়? এইতো ধরে ফেললাম।'

বেয়োনেট নাচালো সৈন্যটি। বেরিয়ে আসতে বলছে। ভয়ে ভয়ে দরজা গলিয়ে মাটিতে পা রাখলো আনিস। তখনই সবুট লাথি পড়লো বুকে, 'বান্‌চোৎ, দেরী করলি ক্যান্, হাতিয়ার কোথায়?' লুটিয়ে পড়ে গেল ও। আরও দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন। অন্য একজন দরজা দিয়ে দোকানের ভিতরে ঢুকলো। সবকিছু উল্টে-পাল্টে শরু করলো তলাশী। বুটের আঘাতে আলু, মরিচ, ডাল আর মাটির পাত্রে রাখা মাল-পত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল। সাব মেশিনগানের ধাক্কায় উল্টে গেল জিনিস-পত্র বোঝাই র‍্যাক। ক্যাশবাক্সের কাছে গিয়ে থামলো সেনাটি। একটানে ডালা খুলে ফেললো। এক টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা থেকে শুরু করে একশ' টাকার নোটের স্তুপ ছিল। শটাশট ওগুলো তুলে সেনাটি প্যান্টের পকেটে ঢোকালো। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। বললো, 'নাই, কিছু নাই।'

দাঁড় করানো হয়েছিল আনিসকে। ধাপ্ ধুপ্ করে আরও কয়েকটা বুটের লাথি হাঁকানো হলো ওর শরীরে। অশ্লীল গালি দিয়ে একজন সেনা জিজ্ঞেস করলো, 'বল্ হাতিয়ার কোথায় রেখেছিস্? দরজা খুলতে দেরী করলি কেন?' জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুলছিল আনিস। কিন্তু তার আগেই সাব মেশিনগানের বাঁটের আঘাতে আবার মটিতে পড়ে গেল। একজন সৈন্য ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা কোথায়?'

'ওরা? কারা স্যার?'– হতভম্ব আনিস কোন রকমে বললো। বুকের ওপর রাইফেলের কুঁদো এসে পড়লো, 'বান্‌চোৎ, ওরা কারা জানিস না?' সেনাটি ঠেলে একটা গাছের কান্ড কাছে নিয়ে এলো ওকে। এই সুযোগে আনিস তাকিয়ে দেখলো গ্রামের সর্বত্র মিলিটারি গিজগিজ করছে। সবে সকাল। সূর্য উঠছে। কিন্তু সাত সকালে এসব কি দেখছে আনিস! স্বপ্ন না সত্যি? ঠিকমতো ঠাঁহর করতে পারছে না ও।

ছড়িয়ে থাকা মিলিটারির দল বাড়ি বাড়ি ঢুকছে। তল্লাশী করছে। যুবক-তরুণদের বেদম প্রহার করছে। লাথি মারছে বয়স্কদের। যতোদূর চোখ যায় শুধু অত্যাচার আর নির্যাতনের দৃশ্য। গ্রামটায় যেন হঠাৎ পিশাচের দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

****

সকাল সাড়ে আটটা মতো। গোটা গ্রামে তল্লাশী অভিযান শেষ করেছে সামরিক বাহিনী। এবার যুবক-তরুণ-বয়স্ক এবং মহিলাদের অনেককে ধরে নিয়ে স্কুল মাঠ, খেলার মাঠ অথবা বড় কোন উঠোনে দাঁড় করানো হয়েছে। সৈন্যরা বহু দলে ভাগ হয়ে আলাদা আলাদাভাবে এই কাজে অংশ নিয়েছে।

এর একটি অংশের দৃশ্য। যৌথ পরিবারের অনেকগুলি ঘর। বাইরে মাঠের মতো বড় উঠোন। সেখানে দাঁড় করানো হয়েছে ৫০/৬০ জন মানুষকে। এদের মধ্যে যুবক-তরুণ-বয়স্ক এবং মহিলা রয়েছেন। শিশুদেরকেও এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। সৈন্যরা ঘিরে রেখেছে সবাইকে। একজন অফিসার কিছু নির্দেশ দিলো। আটক লোকদের এবার বসতে বলা হলো। আতঙ্কিত এবং দিশেহারা মানুষগুলো অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করলো। এরপর শুরু হলো বাছাই পর্ব। যুবক এবং তরুণদেরকে আলাদা করে বসানো হলো। বয়স্কদের আলাদা করা হলো। মোট চার ভাগে ভাগ করে বসানো হলো মানুষগুলোকে। শিশুদের যেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল, ওদের সেখানেই রাখা হলো।

চারপাশে ইতস্ততঃ ঘুরছে হেলমেট এবং অনেক রকমের প্যাক বাধা সৈন্যরা। ওদের হাতের একে-৪৭ রাইফেলগুলোর বাঁট বগলতলায় রাখা এবং নলগুলো কিছুটা মাটির দিকে নিচু করা। একজন অফিসার বেতের ছড়ি হাতে পাইচারি করছে, আর মাঝে মাঝে পায়ের দিকে প্যান্টের ওপর শটাশট ছড়ি দিয়ে আঘাত করছে। হঠাৎ বন্দি মানুষগুলোর দিকে আগুন চোখে তাকালো সে। প্রত্যেকটি মানুষকে চোখের আগুনে যেন ভস্ম করে দিতে চাইলো। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো, ‘বানচোৎ, মাদারচোতের বাচ্চারা। তোদের সবাইকে খুন করে ফেলবো। ক্যাম্পে ধরে নিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করাবো। বান্‌চোৎ, তোমরা ডাকাতদের আশ্রয় দাও। শালাদের হাতিয়ার লুকিয়ে রাখো। বল্ মাদারচোতের বাচ্চারা হাতিয়ার কোথায়?’ ধাঁই করে সামনের এক মধ্য বয়সীকে লাথি হাঁকলো অফিসার। সবুট লাথি খেয়ে ছিটকে পড়লো লোকটি। তার উপর আরও কয়ে ঘা ছড়ির আঘাত হানা হলো। গোঙাতে থাকলো মানুষটি।

আবার পাইচারি করতে করতে অফিসার এক যুবকের চুলের মুঠি খাঁমচে ধরলো। তারপর হাঁটু চালিয়ে তাকে ঠেলে দিলো সামনের সৈনিকের কাছে। নির্দেশ দিলো, ‘পিঠের চামড়া তুলে ফেলো।’ সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য রুলার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো যুবকটির ওপর। বিকট চিৎকারে কেঁপে উঠলো এলাকা। কিন্তু বেপরোয়া রুলারের আঘাত থামলো না। লুটিয়ে পড়লো যুবক।

আবার চিৎকার করে উঠলো অফিসার, ‘বল্ বান্‌চোতের বাচ্চারা হাতিয়ার কোথায়? মাদারচোতরা কোথায়? না বললে সবক’টাকে পিটিয়েই মেরে ফেলবো।’

এতক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদছিল মহিলারা। শিশুদের চোখে পানি। যুবকটির চিৎকারে এবার সবাই ডুকরে উঠলো। কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অকস্মাৎ অফিসারের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললো, ‘আমরা কিছু জানি না বাবা, ছাওয়ালটাকে ছেড়ে দাও বাবা। আ মরা ছাওয়াল, মরে যাবে।’ অফিসার এবং সৈন্যদের লাথি খেয়ে ছিটকে গেল সবাই। চিৎকার করে জবাব দিলো, ‘হাতিয়ার এবং ডাকাতের দল কোথায় আছে বল্, তাহলে ছেড়ে দেবো। বল্?’

প্রায় ৮০ বছরের মতো বয়স্ক এক বৃদ্ধ হাতজোড় করে বললো, ‘বিশ্বাস করো বাবারা, আমাদের এই গ্রামে কুনু ডাহাত নাই। খুব ভালো গাঁও এডা।’ বৃদ্ধটির দিকে ঠিক কেউটে সাপের মতো এগিয়ে গেল এক দশাসই সেনা। সে ঘাড় ধরে দাঁড় করালো বসে থাকা বৃদ্ধকে।। তারপর বললো, ‘বাল্ তো মনে হয় একটাও কাঁচা নেই। মাদারচোৎ কাঁহেকা! ডাকাত নাই তাহলে অস্ত্র নিয়ে যারা ঘোরে তারা কি ফেরেস্তা? যাদেরকে বাড়িতে বসিয়ে আদর করে খাওয়াস্– তারা কি তোর জামাই? বান্‌চোৎ, মরার বয়স হয়ে গেল, তাও মিথ্যা কথা ছাড়ো নাই। পাছার মধ্যে রুলার ঢুকিয়ে মিথ্যা বের করে দেবো শালা বান্‌চোৎ।’ ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হলো বৃদ্ধকে। উল্টে পড়ে গেল বেচারা। কোন রকমে উঠে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

অফিসার কিছু ইঙ্গিত করলো। সৈন্যটি থেমে দাঁড়ালো। হাতের ছড়িটা শপাং শপাং করে নিজেরে পায়ে বসালো অফিসার। জ্বলন্ত চোখে সবাইকে পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর বন্দিদের মুখোমুখি দাঁড়ালো, ‘বান্‌চোতের বাচ্চারা, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে বলে মনে হচ্ছে না। বাঁকা না হয়ে উপায় নেই দেখছি।’ কয়েকজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা হাউমাউ করে উঠলো। জোড়হাত করে আল্লাহ’র দোহাই দিয়ে কিছু বললো তারা। তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গুঞ্জন তুললো অন্যান্যরাও। ‘শাট আপ’– গর্জে উঠলো অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কাকুতি-মিনতি। চেচিয়ে বললো অফিসার, ‘এই গ্রামে কারা কারা ডাকাতি করে, অস্ত্র নিয়ে ঘোরে, তারা এখন কোথায়? না বললে কোন মাদারচোতের জীবন থাকবে না। বল্‌ বান্‌চোতের বাচ্চারা সব বলবি কি না?’

নিশ্চুপ বন্দিরা। কেও কথা বললো না। একজন মুরুব্বি মুখ খুললেন হঠাৎ, ‘বাবারা, আমরা মুরুক্ষু মানুষ, জমি-জিরাতের কাম কইরা খাই। এহানে ডাহাত আসবি ক্যাম্‌নে? তয় একজন ডাহাত আছে।’ ‘কই, কোথায়? হাতিয়ার আছে তার কাছে?’– আগ্রহে চিৎকার করে উঠলো অফিসার। মুরুব্বি জবাব দিলো, ‘আছিলো ছ্যার। থানার পুলিশ্‌রে দিয়া দিছে। অনেকগুলো কেস আছে। পুলিশের লগে খাতির আছে। কিন্তুক ডাহাতি ছাড়ে নাই।’ প্যান্টের উপর ছড়ি চালাতে চালাতে অফিসার বললো, ‘কোথায় সে, কি নাম?’ মুরুব্বি বললো, ‘নাম নিজাম স্যার। বাড়ি ওই গাঁওয়ের কোণায়। কিন্তু বাড়িত কেও নাই স্যার। আমরা গেরামের মানুষ এক হইয়া ওই ডাহাত্‌রে খেদাইয়া দিছি।’

এ সময় সৈন্যদের সঙ্গে আসা এক পুলিশ কর্মকর্তা মিলিটারি অফিসারটির কানে কানে বললো, ‘স্যার, আমাদের ওই ইনফরমারের কথা বলছে স্যার।’ চোখ পাকিয়ে পুলিশের কথা শুনলো অফিসার। তারপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, ‘বান্‌চোৎ, একজন ভাল লোককে ডাকাত বলো! সিপাহি, হাঁকাও বান্‌চোৎকে।’ একে-৪৭ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো এক সৈন্য। পিটিয়ে আধমরা করে ফেলা হলো মুরুব্বিকে।

ঘড়ি দেখলো অফিসার। কিছু একটা কমান্ড করলো। মারপিট বন্ধ করলো সৈন্যটি। অফিসার আবার ইঙ্গিত করলো। এবারে বয়স্ক বন্দিদের ভেতর থেকে মোট পাঁচজনকে বাছাই করা হলো। এদের মধ্যে একজন ৪০/৫০ বছর বয়সী মহিলাও আছেন। সৈন্যরা মাটিতে ২০টি খুঁটি পুতলো। গরুর গোয়াল থেকে এসব সংগ্রহ করা হয়েছে। আরো সংগ্রহ হলো গরুরর দড়ি। এবার এক একজনকে মাটিতে উপুর করে শোয়ানো হলো। হাত-পা টানটান করা হলো। তারপর খুঁটিগুলোর সঙ্গে সেই হাত-পা শক্ত করে বাধা হলো। শুরু হলো বেতের ছড়ি দিয়ে আঘাত। একজন বন্দির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তিনজন করে সেনা। তাদের ছড়ি অবিরাম আঘাত হানতে থাকলো পা, শরীরের পিছনের অংশ এবং পিঠের উপর। হাত-পা বাধা মানুষগুলোর গগনবিদারী চিৎকারে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো গোটা আকাশ-বাতাস।

একইভাবে নির্যাতন চলছে গোটা গ্রাম জুড়ে। এলাকার আকাশ-বাতাস তাই পাল্লা দিয়ে এ সম্মিলিত চিৎকারের শব্দ বুকে ধারণ করছে।

নির্যাতনের পাশাপাশি অন্যান্য বন্দিদের জেরা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ‘ডাকাতদের’ ধরিয়ে না দিলে এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্র না দিলে– পিটিয়ে মেরে ফেলা হবে তাদের বাবা-মা ও আত্মীয়দের। গ্রামের সমস্ত যুবক-তরুণদের মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে। আর জ্বালিয়ে দেওয়া হবে সব মানুষের বাড়ি-ঘর। গোটা গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়া হবে– বলে ভয় দেখানো হলো।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেনারা তেমন কোন তথ্য পেলো না। পেলো না অস্ত্র আর ‘ডাকাত’ দলকে। তবে সেনারা চিহ্নিত করলো অনেকগুলো মানুষের বাড়ি, বাছাই করলো অনেক তরুণ আর যুবককে।

****

আবার সেই জোনাব আলী। বেলা এখন প্রায় সাড়ে ১০টা। জোনাব আলী দ্বিতীয়বারের মতো হতভম্ব হয়ে দেখলো, তার বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে সারি সারি মিলিটারি। ওদের পকেটগুলো ভর্তি। হাতে নানা ধরনের পুটলি। হয়তো লুটপাটের মাল! জোনাব আলী দেখলো, শুধু মিলিটারিই নয়। ওদের সঙ্গে রয়েছে বহু তরুণ আর যুবক। সবাই বন্দি। ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দূরের গ্রামটির দিকে একনজর তাকিয়ে জোনাব আলী দেখলো– ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে। হয়তো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘর-বাড়ি।

হ্যাঁ, পাইকারী হারে লুট, অত্যাচার-নির্যাতন, ধর্ষণ আর বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার পর অপারেশন শেষ হয়েছে সেনা দলটির। এখন বন্দিদের নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে সেনা ছাউনিতে। একটা স্বাধীন দেশে এ দৃশ্য হতভম্ব করার মতোই। সুতরাং জোনাব আলী হতভম্ব হলো।

(পাঁচ)

জায়গাটা আগে ছিল তরুণ-তরুণীদের কলকাকলিতে মুখরিত। কিন্তু এখন চলছে সামরিক শাসন। তাই সব বন্ধ। এটা একটা কলেজ বাউন্ডারি। চারদিকে কাটাতারের বেড়া। ভিতরে অবস্থান নিয়েছে সৈন্যরা। কলেজ ক্যাম্পাসকে পরিণত করা হয়েছে সামরিক ব্যারাকে। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া এবং কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রমকে। তার বদলে এখানে চলছে সামিরক বাহিনীর প্রশাসনিক কার্যক্রম। ক্যাম্পাসের মাঠগুলোকে পরিণত করা হয়েছে প্যারেড গ্রাউন্ডে। ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেলগুলোকে করা হয়েছে সেনা মেস-এ। বাউন্ডারির বিভিন্ন স্থানে বসানো হয়েছে গার্ডপোস্ট। মেইন গেটে মিলিটারি পুলিশ চেকপোস্ট। বেশ কয়েকটি ভবন এবং টিনশেড ঘরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে আর্মারি ডিপো। সেখানে অবস্থান নিয়েছে ট্যাংক, আরমারড কার, কামান, মেশিনগান ইত্যাদি। বসানো হয়েছে ওয়্যারার গার্ড। অন্যান্য গার্ডপোস্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলোতে রয়েছে একে-৪৭ ধারী সেনা গার্ড বা সেন্ট্রি। ক্যাম্পাস এলাকার গাছ-পালার গোড়ায় ৩ থেকে ৫ ফুট পর্যন্ত চুনকাম করা হয়েছে। ফলে গোটা এলাকায় ফিরে এসেছে ক্যান্টনমেন্টের গন্ধ। কলেজ প্রশাসকদের বাসভবনগুলোকে নিয়ে এখন গড়ে তোলা হয়েছে অফিসার্স কোয়ার্টার। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসরুমগুলো পরিণত হয়েছে আর্মি অফিসার্স রুম, এক্সারসাইজ রুম, ডাটা বেইজ অথবা ইকুইপমেন্ট রুমে। এর অনেকগুলোকে আবার কনসেনট্রেশন রুমেও পরিণত করা হয়েছে। কনসেনট্রেশন রুমগুলোর মধ্যেও আবার সেকশন আছে। কোনটি হয়েছে টর্চার চেম্বার, কোনটি কাস্টডি। এ ছাড়া কোনটি লাইট আর্মস ডিপো বা রেডিও রুম হিসেবেও ব্যবহার হচ্ছে।

একটি চারতলা ভবন। এর শেষ তলায় হল রুম। রুমের গেটে এবং আশপাশে কড়া সেন্ট্রি। প্রত্যেক সেন্ট্রির হাতে চকচকে চীনা মডেলের একে-৪৭ রাইফেল, কারবাইন ও ব্রেটাগান। রুমের ভেতরে বৈঠক চলছে। বৈঠকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক ব্রিগেডিয়ার। বাকি যারা অংশ নিচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছে কর্নেল, বেশ কয়েকজন লেঃ কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্টেন এবং এক ডজনেরও বেশি গ্রুপ লিডার ও এনসিও। অনেক্ষণ ধরে বৈঠক চলেছে। এখন শেষ পর্ব। বক্তব্য রাখছেন ব্রিগেডিয়ার।

তিনি বলছেন, প্রত্যেকটি অপারেশনেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। আমরা যে অপারেশন পরিচালনা করছি, তাতে আসল কালপ্রিটরা ধরা না পড়ুক– তবুও লাভ আছে। আসলে আমাদের এই অপারেশনগুলোকে সাইকোলজিক অপারেশন বলা যেতে পারে। সারা দেশের প্রতিটি আনাচে-কানাচে পর্যন্ত আমাদের এ অপারেশন চলছে। এরফলে আমাদের শত্রপক্ষের মনোবল ভেঙে যাবে। মানুষ

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস রাখবে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো– গেরিলারা শক্তিশালী হতে পারবে না। ওরা সব সময় ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে থাকতে বাধ্য হবে। বাইরে বেরুতে পারবে না। ধীরে ধীরে ওরা একদিন শেষ হয়ে যাবে।

এইটুকু বলার পর ব্রিগেডিয়ারের সারা মুখমণ্ডল জুড়ে যে নির্ভেজাল বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠলো– তাতে মনে হতে পারে লোকটি বোধহয় সহজ-সরল। তার হাতের ছড়িটি এসময় নিজের আরেক হাতের উপরই ওঠা-নামা করছিল। মুখের হাসি বোধহয় এরার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। এক পা দু'পা করে পাইচারি করলো ব্রিগেডিয়ার। কিন্তু হঠাৎ সব কিছুতে একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করলো। কারণ উঠে দাঁড়িয়েছেন একজন লেঃ কর্নেল। মনে হয় বেচারা কিছু বলার জন্য অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিল। তার এক একটি কথা ব্রিগেডিয়ারের শরীরে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটাতে থাকলো। তার শরীরের এক একটি সেলে ডজনখানেক করে বিস্ফোরন ঘটে চললো।

লেঃ কর্নেল বললো, স্যার আমরা তো পাকিস্তানি মিলিটারি নই। এই দেশটাও পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধ করে এই দেশটা পাওয়া গেছে। তাছাড়া দেশের শাসনভার রাজনীতিকদের হাতে থাকবে, দেশে গণতন্ত্র থাকবে– এটাই তো ছিল মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য। এতো আত্মত্যাগ, এতো রক্তক্ষয় করে এদেশের মানুষ যে স্বাধীনতা লাভ করেছে– তাতো এদেশের মানুষের নির্ভয়ে বেঁচে থাকার জন্যই। কিন্তু আমরা এই দেশের সৈনিক হয়ে যদি ঠিক পাকিস্তানি সেনাদের মতো মানুষের উপর অপারেশন চালাই, তাঁদের উপর দমন-নির্যাতন-অগ্নিসংযোগ-গ্রেফতার-ফায়ারিং স্কোয়াড চালাই– তাহলে পাকসেনাদের থেকে আমাদের পার্থক্য রইলো কোথায়? মানুষ যদি আমাদের দেখে ভয়-ই পায়, তাহলে আর মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা এসবের অর্থ থাকলো কোথায়? নিজেরা নিজের দেশের মানুষের মনোবল ভেঙে দেয়ার জন্য সাইকোলজিক অপারেশন চালানোর ব্যাপারটি স্যার– আমার কাছে ভাল লাগছে না।

একটু থামলো লেঃ কর্নেল। তার উদাস দৃষ্টি এখন সামনের দেয়ালে টাঙানো বিশাল আকৃতির বাঁধানো ছবিটির দিকে। ছবিটি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের। সেখান থেকে লেঃ কর্নেলের দৃষ্টি নেমে এলো ব্রিগেডিয়ারের দিকে। সে দেখতে পেলো ব্রিগেডিয়ারের মুখে ক্রুর হাসি। চোখে ফুটে উঠেছে এক ভয়ঙ্কর জিঘাংসা। লেঃ কর্নেল এর সবটাই স্পষ্ট দেখতে পেলো। কিন্তু সে একটি জিনিসই দেখতে পেলো না। সে জিনিসটি হলো– ব্রিগেডিয়ার ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ করা এবং সামরিক আইনবিরোধী ভূমিকা নেওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালে রায় দিয়ে ফেলেছেন। রায় অনুযায়ী লেঃ কর্নেলের স্থান হবে ফায়ারিং স্কোয়াড।

(ছয়)

একটা হাতব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে হাঁটছে বিনু। গ্রামের মেটো পথ। আর একটু এগুলেই পাকা সড়ক। সেখানে মিনিবাস স্টপেজ। বাস ধরার জন্যই বিনু যাচ্ছে। গন্তব্য রাজধানী ঢাকা। ইচ্ছে করলে কোচ সার্ভিসে টিকেট কেটে যেতে পারতো ও । কিন্তু তা যাচ্ছে না। যাবে লোকাল বাসে। কারণ কোচগুলো ঘন ঘন সামরিক চেকপোস্টের মুখোমুখী হয়, যাত্রীদের উপর অনুসন্ধান চালানো হয়। সন্দেহ হলেই নামিয়ে নেওয়া হয়। তাছাড়া তল্লাসী তো আছেই। মিলিটারি, গোয়েন্দা বিভাগ এবং পুলিশের চোখে তরুণ-যুবকরা দারুণ সন্দেহজনক। একটু কিছু মনে হলেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিনু এমনিতেই যুবক, তার উপর চেহারায় আছে একটা অন্যরকম আভা। তার চেয়েও বড় কথা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সামরিক সরকারের লোকেরা। সুতরাং সাবধান না হয়ে উপায় নেই।

অনেকটা গ্রাম্য পোশাকে, তবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে চলেছে বিনু। ক্লিনসেভড হওয়ায় এখন আর খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো নেই। চেহারায় একটা সরল-সোজা, হাবা-গোবা ভাব এনেছে– যাতে একজন সাধারণ কর্মজীবী যুবক বলে মনে হয়। হাতব্যাগটাও সেই অনুযায়ী বেছে নিয়েছে ও। লোকাল বাসে যেতে সুবিধা হলো– যে কোন স্টপেজে নেমে যাওয়া যায়। কোন গোয়েন্দা পিছু নিলে খুব একটা সুবিধা করতে পারে না তখন। তাছাড়া চেকপোস্টগুলোও এড়িয়ে চলা যায়। বিনুকে আপাততঃ লোকাল বাস হয়ে নগরবাড়ি ঘাটে পৌঁছাতে হবে। তারপর ঢাকার পথে কোন বাস ধরতে হবে।

স্টপেজটার আশ-পাশে অল্প কয়েকটি দোকান। কোনটি মুদিখানা, কোনটি শুধুমাত্র পান-বিড়ি-সিগারেটের। আর আছে একটা চায়ের দোকান। বিনু সাবধানে চারদিকটা দেখে নিলো। তারপর চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বসে পড়লো। চায়ের অর্ডার দিলো।

চা পান করতে করতে সড়ক পথের দিকে লক্ষ্য রাখলো। যে কোন মুহূর্তে এসে যাবে বাস। আর কাউকে অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য পাশের পান-সিগারেটের দোকানে বয়সী ২/৩ জনকে বিড়ি ফুঁকতে দেখা যাচ্ছে। একজন পানও নিচ্ছে। সবাই কৃষক বা মজুর। হয়তো বাসে কোথাও যাবে।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। এরমধ্যে ভারী মেশিনগান ফিট করা দু'টি সামরিক কনভয় খুব দ্রুত সড়কপথ দিয়ে চলে গেছে। এটা এখন স্বাভাবিক ব্যাপার। ফাঁকা জায়গায় কনভয়গুলো খুব দ্রুতই চলে যায়। হয়তো আস্তে যাওয়ার সাহস পায় না! কিংবা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, জনসাধারণকে বিশ্বাস করে না! আর এমন হবেই বা না কেন? দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের কনভয় এবং সামরিক বা পুলিশের ক্যাম্পগুলোতে গেরিলা হামলা হচ্ছে প্রায়ই। সুতরাং সাবধানে চলাফেরা করে ওগুলো।

আরো কিছুক্ষণ পর মুড়িরটিন জাতীয় একটা বাস এলো। লোকজনে ভর্তি। থামার পর যাত্রীরা নামতে শুরু করলো। বিনু ভাল করে খেয়াল করলো খাঁকি বা সামরিক পোশাকপড়া কোন লোক আছে কিনা। আরো খেয়াল করলো কোন লোক সন্দেহজনক কিনা। পুরো নিশ্চিত হবার পর বাসের দিকে এগুলো ও। এরমধ্যে বেশ কয়েকজন যাত্রী নেমে পড়েছে। কন্ডাক্টর 'কাঁশিনাথপুর-নগরবাড়ি' বলে চিৎকার করছিল। বিনু উঠে পড়লো। বাস ছেড়ে দিলো। তারপর কিছুদূর এসে আরেকটি অনির্ধারিত স্টপেজে থামলো। আরো কিছু লোক নামলো। এবার বসার ছিট পেলো বিনু। এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

ঘন ঘন যাত্রী ওঠা-নামা করার মধ্যদিয়ে চলছিল মুড়িরটিন। হঠাৎ ব্রেক কষে থেমে পড়লো। এবারে কোন কোলাহল নেই। ঝিমুনির অভিনয় করছিল বিনু। কিন্তু শক্ত ব্রেক কষাতে সচকিত হয়ে উঠলো। বাইরে তাকিয়ে দেখলো দোকান-পাটগুলোর ঠিকানায় কাঁশিনাথপুর লেখা। তারমানে নগরবাড়ি মাত্র ৪ মাইল দূরে। বাস থামলো কেন! স্টপেজ বলে? না, ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলো ও। কারণ বাসে উঠছে কয়েকজন আর্মি এবং পুলিশ। শিরদাড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল বিনুর। তবে উপরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক চোহারা বজায় রাখলো। পুরো এক মিনিট ব্যয় করলো ওরা। তারপর পুলিশগুলো সার্চ শুরু করলো। প্রত্যেক যাত্রীর ব্যাগ, পুটলি এবং দেহ সার্চ করা হলো। বিনুর ব্যাগ এবং দেহ সার্চ হলো। তারপর নেমে গেল ওরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলো বিনু। বোঝা যায় এটা ওদের দায়সারা গোছের রুটিনওয়ার্ক। পাশেই হয়তো আর্মি চেকপোস্ট। অতকিছু দেখার প্রয়োজন মনে করলো না বিনু। বাস চলতে শুরু করলো। আগের মতো ঝিমুতে লাগলো ও।

নগরবাড়ি ঘাট। প্রবেশ মুখে বিরাট আকারের আর্মি চেকপোস্ট। বালুর বস্তা সাজিয়ে বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা পোস্ট বসানো হয়েছে। তাতে পাতা রয়েছে ভারী ও হালকা মেশিনগান। ব্যারিয়ারের সামনে বিনুদের বাস থেমে দাঁড়ালো। উঠে এলো হেলমেট পড়া টমিগান হাতে কয়েকজন আর্মি। সকল যাত্রীকে

নামার ইঙ্গিত করা হলো। নিঃশব্দে আদেশ পালন করলো সবাই। বিনুও বাইরে এসে লাইন করে দাঁড়ালো। ভিতরে ভিতরে ঘামছে ও। আর্মিদের একটা দল জিজ্ঞাসাবাদসহ দেহতল্লাশী করলো। আর কয়েকজন বাসের ভিতরে যাত্রীদের ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসিপত্র তন্নতন্ন করে হাতরালো। তেমন কোন কিছুই পেলো না ওরা। তবে লাইনে দাঁড়ানো এক তরুণ সমস্যা তৈরি করে ফেলেছে। ঢাকার কোন কলেজের ছাত্র। মাথার চুল বেশ বড়। গায়ে রঙচঙে সার্ট। হাতে বালা, গলায় চেন। আর্মিরা তরুণটিকে ছেঁকে ধরেছে। রাজনীতি করে কিনা, মাস্তান কিনা, গলায় মালা কেন, চুল বড় কেন– ইত্যাদি নানান প্রশ্নে জর্জরিত করে ফেলেছে। ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে প্রশ্নকারীরা। এক পর্যায়ে চুলের মুঠি ধরলো এক আর্মি। আরেকজন সবুট লাথি হাঁকলো পাঁজর বরাবর। হ্যাঁক– শব্দ করে কুকড়ে গেল তরুণ। তারপর ওকে চেকপোস্টের পাশে ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। বাকি যাত্রীদের বাসে উঠতে বলা হলো। বাস আবার চলতে থাকলো।

ঘাট পর্যন্ত এক কিলোমিটারের কম রাস্তা পেরুতে আরো তিন জায়গায় আর্মি চেক হলো। সবগুলো বাধা পেরিয়ে তবেই বাস ঘাটে ভিড়লো। ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে আমচুর হয়ে গিয়েছিল বিনু। এখন খানিকটা হাঁপ ছাড়লো। বাস থেকে নেমে ফেরীর দিকে না গিয়ে লঞ্চের দিকে এগুলো। ফেরীতে আর্মি থাকার সম্ভাবনা আছে। একটা লঞ্চ এখনই ছেড়ে দেবে। হাঁকডাক করছে। বিনু উঠে পড়লো তাতে। কিন্তু যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। লঞ্চে আর্মি না থাকলেও সশস্ত্র পুলিশ ও আনসার রয়েছে। অবশ্য আর্মির মতো এরা অতো বিপদজনক নয়। বিনু ওপরতলার দিকে না গিয়ে নিচতলায় ঢুকে পড়লো। ফাঁকা একটা আসন দেখে এগিয়ে গেল। আসনটা পছন্দসই। জানালার ধারে। বিপদ দেখলে লাফিয়ে পানিতে ঝাঁপ দেওয়া যাবে। বসে পড়লো বিনু। কিছুক্ষণ পর চলতে শুরু করলো লঞ্চ। ব্যাগটা কোলের উপর রেখে ঝিমুনির ভাব টেনে আনলো ও।

ঢাকায় অনেকগুলো কারণে যেতে হচ্ছে বিনুকে। পার্টিতে নানান প্রশ্ন জমে উঠেছে। একদিকে সরকারি বাহিনীর বর্বর দমননীতি, আরেকদিকে সিওসি (অর্গানাইজেশন অব সেন্ট্রাল কমান্ড)-এর যোগসূত্রহীন সিদ্ধান্ত নিয়ে পার্টি-সংগঠনে এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটির বৈঠক হয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই সিওসি'র কাছে যাচ্ছে বিনু।

সমন্বয় কমিটির বৈঠকে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে, বার বার সিওসি থেকে বলা হচ্ছে শীঘ্রই সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান শুরু হচ্ছে। অভ্যুত্থানটা শুরু হবে সামরিক বাহিনী থেকে। তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে গণসংগঠনগুলোসহ গণবাহিনীকে। জিরো আওয়ারে ঘটনা ঘটবে। দিন-তারিখটা যে কোন সময় জানিয়ে দেওয়া হবে। এই মৌখিক সংকেতটাকে একইভাবে দেওয়া হচ্ছে মাসের পর মাস ধরে। কিন্তু সংকেতের দিন-তারিখ আসছে না। পার্টি সার্কুলারগুলোতে বলা হচ্ছে, দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি বিরাজ করছে, অকল্পনীয় গতিতে ভিতরে ভিতরে গুণগত পরিবর্তন ঘটছে। এখন শুধু বিস্ফোরনের অপেক্ষা। সেই অপেক্ষায়ই দিন গুনছে পার্টি-সংগঠকরা। এদিকে একটি সিপাহী-জনতার গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন মহান বিপ্লবী কর্নেল আবু তাহের (বীর উত্তম)। সিওসি এবং পলিটব্যুরোর ভুল সিদ্ধান্তের কারণে এই অবস্থা। প্রশ্ন উঠেছে, জিয়াউর রহমানের মতো একজন প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক অফিসারকে কেন বিশ্বাস করা হয়েছিল? কেন কর্নেল তাহের তার প্রাণ বাঁচালেন, তাকে নবজীবন দান করলেন? সেই জিয়াউর রহমান কি আজ কর্নেল তাহেরকে বাঁচাবে? যদি বাঁচাতোই, তাহলে অন্ধ কারা প্রকোষ্ঠে প্রহসনের বিচার শুরু করতো না। জিয়াউর রহমান যদি মানবপ্রেমিক ও দেশপ্রেমিক হতো– তাহলে প্রতিদিন সেনাবাহিনীতে শুদ্ধি অভিযানের নামে শত শত মুক্তিযোদ্ধা সৈনিককে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে অথবা রাতের আঁধারে কারাগারের ভেতর ফাঁসী দিয়ে হত্যা করতো না।

জনগণ, গণবাহিনী এবং গণসংগঠনগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য সারাদেশে হত্যা ও দমননীতি চালাতো না। এই ধরনের এক গণবিরোধী সামরিক অফিসারের সঙ্গে পার্টি নেতৃত্ব কেন বন্ধুত্ব করতে সায় দিয়েছিল? কেনই বা কর্নেল তাহেরকে ৭ নভেম্বরে বেতার-টিভিতে সিপাহী বিপ্লবের নেতৃত্বদানের কথা বলতে দেওয়া হলো না? কেন তাঁর বদলে জিয়াউর রহমানকে কথা বলতে দেওয়া হলো? এখন বলা হচ্ছে, জিয়াউর রহমান সাম্রাজ্যবাদের দালাল ছিল। পার্টি নেতৃত্ব কেন এটা আগে জানেনি? তারপর আরো প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে ৭ নভেম্বর ভোরে সিপাহী-জনতার গণঅভ্যুত্থান ঘোষণা করা হলো, বেতার-টিভিতে গণবাহিনী, জাসদ আর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার নেতৃত্ব দানের কথা বলা হলো। কিন্তু এই অভ্যুত্থান করার আগে কেন পার্টি চ্যানেলগুলোতে জানানো হলো না? কেন সময়মতো সারাদেশের সমন্বয় কমিটিগুলো কিছু জানলো না? এটা কি হটকারী নয়? কেন, কার স্বার্থে এই হটকারীতা?

আরো বহু প্রশ্ন উঠেছিল বৈঠকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা এবং সিওসি'র অবস্থান সম্পর্কেও কথা উঠেছিল। বলা হয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ পেটি-বুর্জোয়া দল, সে কখনই সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবের মিত্র হতে পারে না। তাই সে আমাদের শত্রু। কিন্তু যে শ্রেণী চরিত্রের কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দলকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে চালানো হচ্ছে খতম অভিযান– সেখানে আমাদের দলীয় চরিত্র কি? একদিকে পার্টি সার্কুলারগুলোতে বলা হচ্ছে– আমাদের দল পেটি-বুর্জোয়াদের নিয়ে, আমরা একে সর্বহারা শ্রেণীর দলে পরিণত করার প্রক্রিয়ায় আছি। ভাল কথা, এটা তো অনেক দিন থেকেই বলা হচ্ছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি গড়া হয়নি। অথচ আমরা কমিউনিস্ট পার্টির মতো সামরিক সংগঠন গড়েছি, পলিটব্যুরো করেছি, কিন্তু পেটি-বুর্জোয়া চরিত্রের বিলুপ্তি ঘটাইনি! এই প্রক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কতোটুকু যুক্তিযুক্ত? তাছাড়া একদিকে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, একইসঙ্গে রাজনৈতিক ভিত্তিধর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে লড়াই– কতোটুকু সঠিক? শুধু তাই-ই নয়, অন্যান্য সকল বামপন্থী নামধারীদলগুলোর সঙ্গেও আমাদের সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। যদিও সবাই আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য লড়ছি। মতাদর্শগত বিরোধ বা পার্টি লাইনগত মতভেদ আছে বলেই কি– এখানে সশস্ত্র লড়াই অনিবার্য? এখানে কি মতাদর্শগত সংগ্রাম কাম্য ছিল না? অথচ একা সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমরা অবিরাম শক্তিক্ষয় করছি। দমননীতির মুখে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। পাল্টা কিছুই করতে পারছি না। অন্যদিকে এই সুযোগে বামপন্থীদের চরম শত্রু মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক চক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। শক্তি বৃদ্ধি করছে।

বৈঠকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপার নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সাংগঠনিকভাবে আমাদের এই জায়গাটা একেবারেই অস্পষ্ট। কেন? প্রথমে আমরা বললাম, রুশ-ভারত আমাদের এক নম্বর শত্রু। পরে এই তালিকায় যোগ করলাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাম। কেন এই বিলম্ব? আর কেনই বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে এক নম্বর শত্রু হিসেবে দেখছি না? প্রথমে আমরা বলেছিলাম চীন এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের মিত্র। এখন বলছি, ওরা স্ট্যালিনের আদর্শচ্যুত, সুতরাং ওরা আমাদের মিত্র নয়। কখনও বলছি, আলবেনীয় কমিউনিস্ট সরকার আমাদের মিত্র, আবার যোগাযোগ রক্ষা করছি ভারতের সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের (এসইউসি) সঙ্গে। এসইউসি'র প্রধান কমরেড শিবদাস ঘোষের থিসিসের হুবহু অনুলিপি তৈরি করে আমাদের পার্টি থিসিস করেছি! কেন? আবার কখনও বলছি, উত্তর কোরিয়া আমাদের মিত্র, কিন্তু বাস্তবে এই মিত্রতার কোন প্রমাণ নেই। তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে কে আমাদের মিত্র, আর কে-ই বা শত্রু? এগুলো এতো অস্পষ্ট থাকার কারণ কি???

বিনুর কাছে অনেক সময় সবকিছু গোলমেলে মনে হয়। যদিও সব প্রশ্নের সঙ্গে ও একমত নয়। ওরও রয়েছে নতুন নতুন বহু প্রশ্ন। ভাবতে গিয়ে কখনও কখনও অবাক হয়ে যায় ও। যেদিন দেশের একমাত্র

দল আওয়ামী লীগ ভেঙে ওদের দলটা তৈরি হলো, সেদিন থেকে দেশে এক নতুন অবস্থা তৈরি হলো। ক্ষমতাসীনদের বিকল্প হয়ে দাঁড়ালো ওর দল। কতো মানুষ যুক্ত হলো এই দলে! পল্টনের মাঠে যখন জনসমাবেশ ডাকা হতো, তখন লাখ লাখ লোক সমবেত হতো বক্তৃতা শোনার জন্য। '৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর পল্টন ময়দানে আর এতো বড় সমাবেশ আওয়ামী লীগও করতে পারেনি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এতো জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়েছিল বিনুদের গণসংগঠন। দেশবাসীর আশা-ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। নেতাদের বক্তৃতায় গণমানুষের মন-মানসিকতা যখন টগবগ করে ফুটছিল– তখন দলে দলে যুবক-তরুণ-ছাত্র-ছাত্রী আর মুক্তিযোদ্ধারা এই দলে সমেবত হচ্ছিলো। সত্যিই একটা পরিবর্তনমুখী শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল দল। কিন্তু তারপর এমন সব ঘটনা ঘটলো– যা ভাবা যায়নি। দলের উপর এমন ভয়াবহ দমননীতি নেমে এলো যে, দলের সবাই আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গেল। গণসংগঠনগুলোর তৎপরতা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর ১৫ আগস্টে হঠাৎ স্বপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলো একদল সামরিক বাহিনীর লোক। ক্ষমতাচ্যুত হলো আওয়ামী লীগ। ক্ষমতায় এলো কট্টর ডানপন্থী চক্র। তারপর আরো কিছু ঘটনা ঘটলো। ক্ষমতায় এলো জিয়াউর রহমান। ইতিহাসের নজীরবিহীন দমননীতি নেমে এলো বিনুদের উপর। বিনুদের দলে বিপ্লবী মন্ত্রণায় দীক্ষিত হয়ে এতো তরতাজা তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর, শ্রমিক, কৃষক সমবেত হয়েছিল যে– পৃথিবীর কোন বামপন্থী সংগঠনে এতো দ্রুত এতো শক্তিভিত কখনও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু দমননীতির মুখে আজ পরিস্থিতি অন্যরকম। দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই এখন কঠিন। যদিও আন্ডারগ্রাউন্ড শক্তিভিত এখনও অকল্পনীয়। তবুও আগের মতো সেই গণভিত্তি আর আছে বলে মনে হয় না। হয়তো গণসংগঠনগুলোর অনুপস্থিতিই এর কারণ। হয়তো দমননীতির মুখে জনগণের ভিতরে আতঙ্ক ঢুকে যাওয়াও একটা কারণ। ফলে পার্টি-সংগঠনে প্রায়ই দেখা দিচ্ছে হতাশা। অবশ্য সিওসি'র গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত মেসেজ এখনও আশাবাদী করে রেখেছে অনেককে।

অতীতের অনেক ঘটনার জন্য কাকে দায়ী করা যেতে পারে– ভেবে পাচ্ছে না বিনু। দলে একজন রহস্যময় ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। তিনি হলেন 'দাদা'। পার্টি প্রক্রিয়া বা সাংগঠনিক দলিলপত্রে বার বার বলা হচ্ছে– পার্টি চলবে যৌথ নেতৃত্বে এবং যৌথ সিদ্ধান্তে। কিন্তু বার বার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সবকিছু চলছে এক ব্যক্তির ইচ্ছায়। সেই ব্যক্তি হচ্ছেন 'দাদা'। পলিটব্যুরো বা সিওসি কিছুই জানে না, অথচ দাদার নির্দেশে অনেক কিছু ঘটছে। পলিটব্যুরো বা সিওসি'র বাইরে দাদাই সবকিছু দেখছেন, করছেন; এবং নির্দেশ দিচ্ছেন। দলের চেইন অব কমান্ডও তার হাতে। অথচ কাগজে-কলমে এসবের কোন অস্তিত্ব নেই। কাগজে-কলমে সিওসি বা পলিটব্যুরোই সব। মাঝে মাঝে বিনুর মনে হয়– পার্টির কোন সিদ্ধান্তই যৌথ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত নয়। এসব সিদ্ধান্ত কোন না কোন ব্যক্তির। জটিল এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। শুধু অস্পষ্টতা তাই বাড়ে। সব মিলিয়ে অনেকের মতো বিনুর কাছেও মনে হয় 'দাদা' সত্যিই রহস্য পুরুষ! কিন্তু কোন বামপন্থী সংগঠনে এ ধরনের রহস্যময়তার অবকাশ আছে বলে বিনুর জানা নেই। শোনা যায় কর্নেল তাহেরকে নাকি তিনিই ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে বলেছিলেন। যে তাহের আজীবন একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্য সেনাবাহিনীকে জনগণের বাহিনীতে পরিণত করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন, সেই তাহের আজ মৃত্যুর মুখোমুখী। হয়তো প্রহসনের বিচারে তাঁর মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। কিন্তু এই মৃত্যুর জন্য কে হবে দায়ী? বিনুর কাছে এর উত্তর জানা নেই। পার্টি সমন্বয় কমিটির বৈঠকে পার্টি লাইন ও রণকৌশল নিয়েও ব্যাপক বিতর্ক হয়। আত্মসমালোচনার মধ্যদিয়ে উঠে আসে নানান প্রশ্ন।

অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। ঘড়ি দেখলো বিনু। হ্যাঁ, আর ১৫/২০ মিনিটের মধ্যেই ঘাটে পৌঁছে যাবে লঞ্চ। বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে খুব সহজেই সময় কেটে গেছে। ঢাকায় সিওসি এবং পলিটব্যুরো

নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর পার্টি-এলাকায় পৌঁছে এবার বিনু আরো কঠিন উদ্যোমে কাজ করবে। মনে মনে শপথ নিলো বিনু। যে কোন মূল্যেই হোক– দেশে বিপ্লব ঘটাতে হবে। পাল্টে ফেলতেই হবে সমাজকে। না হলে শুধু বিনু বা বিনুর মতো বর্তমান সমাজের মানুষগুলোই নয়, তাদের প্রজন্মও দাসত্বের এক নিগূঢ় শৃঙ্খলে আটকে পড়বে। ব্যহত হবে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ। তারা পরিণত হবে পঙ্কিল সমাজের নোংরা জীবে। সমাজটা হয়ে উঠবে আরো বিষময়, আরো অমানবিক। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাতেই হবে।

এবার এলাকায় ফিরে রিতুর সঙ্গে দেখা করবে বিনু। অনেকদিন হলো দেখা করতে পারেনি। কেমন আছে– ভাল করে খোঁজও নিতে পারেনি। অথচ রিতু সব সময় খোঁজ রেখেছে। বিনুর জীবনে এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। পার্টি জীবনে প্রেমটা স্বাভাবিক নয়। কারণ জীবনটা সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোন সময় মারা যেতে পারে। পারে গ্রেফতার হতে। গ্রেফতার হলে কি পরিণতি হবে– সেটা পরিস্কার। আর একটা ব্যাপার হলো– পার্টি শৃঙ্খলার স্বার্থে কোন ঘটনা গোপন রাখা নিষিদ্ধ। কারণ পার্টিজীবনে পার্টিই সব। বাবা-মা-ভাই-বোন বা আত্মীয়-স্বজনের চাইতেও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হলো পার্টি। পার্টির কাছে তাই কোন কিছু গোপন রাখা চলবে না। এরকম গোপন রাখার পরিণাম হতে পারে চরম। একবার এক পার্টি কমরেড একটি সেল্টারে গিয়ে প্রেম করার চেষ্টা করেছিল সেই বাড়ির মেয়ের সঙ্গে। ব্যাপারটি সে পার্টিকে জানায়নি। পরে জানাজানি হয়ে গেলে কমরেডটির শাস্তি হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং পার্টি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার কোন উপায় নেই। যেমন উপায় নেই পার্টি ত্যাগ করার। সে চেষ্টা করার শাস্তিও ফায়ারিং স্কোয়াড।

রিতুর ব্যাপারটা বিনু পার্টিকে জানায়নি। এ জন্য বিনুর মনে কোন অপরাধবোধ নেই। কারণ পার্টি কখনও ওর ব্যক্তিগত বিষয়ে জানতে চায়নি, প্রশ্নও তোলেনি। প্রশ্ন তুললে বা জানতে চাইলে অবশ্যই বিনু সব জানাতো। সুতরাং ব্যাপারটা গোপন থাকার যৌক্তিকতা রয়ে গেছে। বিনু সিদ্ধান্ত নিলো– ঢাকা থেকে ফিরেই রিতুর সঙ্গে দেখা করবে।

লঞ্চ সম্ভবত ঘাটের কাছে পৌঁছে গেছে। যাত্রীরা সব আসন ছাড়ছে। বিনুও ব্যাগটা নিয়ে উঠে পড়লো। ডেকে ওঠার ছোট দরজায় ভীড়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। তারপর বেরিয়ে এলো ডেকে। হ্যাঁ, আর কয়েক শ' গজ এগুলোই ঘাট। কিন্তু ও কি! ঘাট ভর্তি সশস্ত্র মিলিটারি। শুধু মিলিটারি নয়, ট্যাংকসহ হ্যাভী আর্মস পোস্ট দেখা যাচ্ছে। পানিতেও গানবোট। ব্যাপার কি? ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে গেল বিনু। অন্যান্য যাত্রীরাও আতঙ্কিত চোখে দৃশ্য দেখছে। মনে হচ্ছে আস্ত একটা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পা দিচ্ছে সবাই।

তীক্ষ্ণ চোখে সব খেয়াল করলো বিনু। ঘাটের কাছাকাছি অন্ততঃ গোটা পাঁচেক ট্যাংক দেখা যাচ্ছে। কামানও রয়েছে। আর্মারকার এবং ট্রাকগুলোতে শোভা পাচ্ছে মর্টার এবং ভারী মেশিনগান। অনেকগুলো বাঙ্কারও দেখা যাচ্ছে। ওগুলো ওয়ার‍্যার নেট দিয়ে ঢেকে রাখা। বাঙ্কারের পাশে আর্মি চেকপোস্ট। বেশ আগে থেকেই এভাবে রাখা হয়েছে বলে মনে হলো। নদীর গানবোটগুলোকে স্বাভাবিক টহল বোট বলেই মনে হচ্ছে। তবে ঘাট জুড়ে গিজ গিজ করা আর্মিদের মধ্যে শুধু সার্চ পার্টি সতর্ক ও তৎপর। ওরা লঞ্চ আর ফেরিগুলো ঘাটে ভেড়া মাত্রই এক একটা গাড়ি বা যানবাহন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। প্রত্যেক যাত্রীর দেহ এবং ব্যাগ সার্চ করা হচ্ছে। সম্ভবত জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। দূর থেকে সব স্পষ্ট চোখে পড়লো বিনুর। তারমানে বিপুল আর্মি মোতায়েনের অন্য কোন উদ্দেশ্য যদি নাও থাকে– বিনুকেও অনেক প্রশ্নে মুখোমুখী হতে হবে। ওকে সার্চ করে অবশ্য লাভ নেই। প্রশ্ন করেও কিছু জানতে পারবে না, যদি না সত্যি সত্যি আগে থেকে ওরা কোন ইনফরমেশন পেয়ে থাকে।

দুই ঘণ্টা পরের কথা। জেনারেল জিয়ার সকল নিরাপত্তা ব্যূহ ভেদ করে চলেছে বিনু। ও এখন একটা বাসে। আরিচা ঘাটের অনেকগুলো আর্মি চেকপোস্ট অতিক্রম করে এসেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে রাজধানী ঢাকায়।

(সাত)

রাজধানীর সর্বত্র আর্মিদের সতর্ক আনাগোনা। সাদা পোশাকে গোয়েন্দারাও ঘোরাফেরা করছে। আতঙ্কিত জনসাধারণের মাঝে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে সামরিক বাহিনীর পলাতক সদস্যদের, বামপন্থী গেরিলা এবং সামরিক শাসনবিরোধী রাজনীতিকদের। সন্দেহ হলেই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে এবং কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যদিয়ে দেশটা চলছে।

ফুটপাত ধরে হাঁটছিল বিনু। ওর মধ্যে কোন সতর্কতা নেই। গা-ছাড়া ভাব। তাই কারো সন্দেহের চোখে পড়ছে না। নির্বিকার শুধু হাঁটছে। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে একে-৪৭ হাতে আর্মি। রাজপথ দিয়ে মাঝে মাঝেই গোঁ গোঁ করে ছুটে যাচ্ছে মেশিনগান সাজানো আর্মি ট্রাক আর কনভয়।

ফুটপাতের একটা পেপারস্টলে থেমে পড়লো। বিভিন্ন ধরনের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনসহ কিছু রাজনৈতিক পত্রিকা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেশে রাজনীতি বা রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ। আকার-ইঙ্গিতে সামরিক সরকারের সমালোচনাও নিষিদ্ধ। সুতরাং রাজনৈতিক প্রচারণার প্রশ্নই ওঠে না। তা সত্ত্বেও হকারের কাছে তরতাজা রাজনৈতিক সাপ্তাহিকী দেখা যাচ্ছে। আরো কয়েকজন ক্রেতা ও দর্শকের মতো বিনুও হাতরাতে লাগলো ওগুলো। সাপ্তাহিকগুলোর বেশিরভাগই বামপন্থী হিসেবে পরিচিত কিছু নেতাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এর একটির সম্পাদনা করেছেন সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, একটির সম্পাদকের নাম কাজী জাফর আহমেদ, একটির সম্পাদক রাশেদ খান মেনন। মওলানা ভাসানী সমর্থক সাপ্তাহিকও রয়েছে। কী করে এটা সম্ভব? যেখানে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ, রাজনৈতিক নেতারা সবাই জেলে– সেখানে এইসব নেতারা কিভাবে বাইরে রয়েছেন? কিভাবেই বা রাজনৈতিক পত্রিকা বের করছেন? আর্মিরা কিছু বলছে না কেন? ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক। গণশক্তি, নয়াযুগ, নতুন কথা– এইসব হলো পত্রিকাগুলোর নাম।

একটা পত্রিকায় সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহার বিবৃতি ছাপা হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, 'রুশ-ভারতের দালাল কর্নেল (অবঃ) তাহেরকে তিনিই ধরিয়ে দিয়েছেন।' অন্যান্য পত্রিকাগুলোর বক্তব্য প্রায় একই। সামরিক সরকার নাকি রুশ-ভারতের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করেছেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন। পত্রিকাগুলোর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চীনাপন্থী বাম ও মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিসহ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে প্রচার-প্রপাগান্ডার জন্যই এসব পত্রিকা। সামরিক সরকারই এই প্রচারণার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং স্পষ্ট যে, কথিত বামপন্থীরাও বর্তমান সামরিক সরকারের দোসর হিসেবে ভূমিকা নিয়েছে। এ কারণেই সামরিক সরকারের আশে-পাশে দেখা যাচ্ছে চীনাপন্থী তথাকথিত বামপন্থী রাজনীতিকদের, মওলানা ভাসানীর ন্যাপ নেতাদের। আর একই কারণে জাসদ এবং গণবাহিনীর উপর দমননীতিতে সহায়তা করছে আন্ডারগ্রাউন্ড বামগোষ্ঠীগুলো। কিন্তু বামপন্থীদের নীতি তো এটা হতে পারে না! কে রাশিয়ার দালাল, কে ভারতের দালাল– সেটাই বা ওরা বুঝলো কি করে? বিনু নিজেও তো রুশ-ভারত-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তারপরেও ওরা কিভাবে বিনুদের রুশ-ভারতের দালাল আখ্যা দিচ্ছে? ব্যাপারটাই রহস্যজনক। পত্রিকাগুলো ফেলে দিয়ে হাঁটতে থাকলো বিনু। বিক্রেতা হা করে তাকিয়ে থাকলো ওর দিকে।

রিতুর কতগুলো কথা মনে পড়লো বিনুর। রিতুর কথা হলো, লাল পতাকা দিয়ে লাল পতাকা ধ্বংসের চেষ্টা চলছে। কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখন এই পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং কে সত্যিকারের কমিউনিস্ট বা বামপন্থী– তা বোঝা খুব কঠিন। সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা এখন বিশ্বের সমস্ত দেশে লাল পতাকার ছদ্মবেশ নিয়ে বামপন্থী বা কমিউনিস্টদের ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

বিনু এসব কথাগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। তাছাড়া রিতুর বাবা বিনুদের রাজনীতিকে পছন্দ করেন না। অথচ তিনি কমিউনিস্ট পার্টির একজন বিখ্যাত নেতা। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নপন্থী হিসেবে পরিচিত। বিনুরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকার করে না, বরং দেশটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'সংশোধনবাদী' হিসেবে। অন্যান্য আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মতো বিনুরা অবশ্য রাশিয়াকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' বলে না। সে যাই হোক, রিতু ওর বাবার অনুসারী। তাই বিনু সব সময় সব কথার গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু এখন দিতে ইচ্ছে করছে।

(আট)

গভীর রাত। কিছু একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কান খাড়া করলো বিনু।

বেশ আয়েশ করেই ঘুমিয়েছিল। ঢাকা নগরীর ঘিঞ্জি এক বসতি এলাকায় এই সেল্টার। কমরেড মুনির নিয়ে এসেছে। সেও পাশের রুমে ঘুমিয়ে। গত ৩ দিন ধরে দাদা, পলিটব্যুরো এবং সিওসির সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা শেষে ওরা সেল্টারে এসেছিল। কালই চলে যাবার কথা ওয়ার্কিং এরিয়ায়। নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় অনেক বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে পেরেছে বিনু, আবার অনেক বিষয়ে পারেনি। যে বিষয়ে দ্বি-মত থেকে গেছে সেগুলো কর্মক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আবার ভারী শব্দ হলো। একটা নয়, একাধিক শব্দ। তীক্ষ্ণভাবে কান খাড়া করলো বিনু। আস্তে করে উঠে বসলো। আবার শব্দ। ধপা ধপ্ ধরনের ভোঁতা শব্দ। সন্তর্পণে কোন কিছুর চলার মতো। রেইড করা হচ্ছে কি? বিদ্যুৎ গতিতে উঠে পড়লো ও। কান খাড়া রেখে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। ছিটকিনি হাতড়াতে শুরু করলো। হঠাৎ পিছন দিকে খুট করে শব্দ হওয়ায় লাফিয়ে উঠলো ও। কমরেড মুনির দাঁড়িয়ে। ফ্যাসফ্যাসে গলায় মুনির বললো, 'কমরেড কাম অন, রেইড হয়ে গেছে। জলদি চলে আসো।'

হালকা একটা শার্ট গায়ে ছিল বিনুর। খালি পা, লুঙ্গি পরনে। ওই অবস্থায় সবকিছু ফেলে পিছু নিলো মুনিরের। নিঃশব্দে বিড়ালের মতো দেওয়াল টপকালো। অন্ধকারে ভালমতো কিছু ঠাঁহর করতে না পারায় অনেকগুলো হোঁচট খেলো। তবু দূরে বৈদ্যুতিক আলোর আভায় পিছু ছাড়লো না মুনিরের।

আশপাশের কোথাও অনেকগুলো বুটের শব্দ হলো। 'হল্ট' বলে চিৎকার করে কমান্ড করলো কেউ। বিনুর হাত চেপে ধরলো মুনির। বললো, 'কোন ভয় নেই। আর্মি রেইড হয়েছে। তবে ধরা দেবো না।' শব্দ না করে এগুতে চেষ্টা করলো ওরা। আশপাশে বুটের ভারী শব্দগুলো ক্রমেই জোড়ালো হতে থাকলো।

ঢাকার ঘুমটি এলাকাগুলোতে বেশ কিছু সুবিধা আছে। ছোট-বড় অসংখ্য গীজ-গীজে দালান। তার ভেতর দিয়ে একে-বেঁকে চলে গেছে বহু অলি-গলি। যা মুখস্ত রাখা অচেনা কারো জন্য অসম্ভব। কিন্তু মুনিরের সমস্ত কিছু নখদর্পণে। পার্টি-সংগঠন করতে গিয়ে এই গুণটা অর্জন করেছে। তাই বিভিন্ন পথ দিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। সাব-মেশিনগান হাতে আশপাশ দিয়ে আর্মিদের যেতেও দেখলো, কিন্তু ওদেরকে কেউ দেখতে পেলো না।

অনেক গলি এবং ঘিঞ্জি পথ পাড়ি দিয়ে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছুলো ওরা। দু'জনেই রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। এরমধ্যে একটা মেইনরোড পার হতে হয়েছে। তখন দেখেছে ওদের এলাকাটা ঘেরাও করে আছে সশস্ত্র আর্মি ট্রাক আর কনভয়। পথের বৈদ্যুতিক আলোয় স্পষ্ট দেখেছে ওগুলোতে মাথা বের করে আছে হালকা ও ভারী মেশিনগান।

'ওরা জানলো কি করে যে আমরা ওখানে আছি?' অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করলো বিনু। জবাবে মুনির ইতস্ত ত করে বললো, 'কিছু বুঝতে পারছি না।'

'অন্য কোন কমরেড কি ওই এলাকায় থাকে?' ফের প্রশ্ন করলো বিনু। মুনির মাথা নাড়লো, 'নাহ্, আমার জানা মতে ওই এলাকায় আমি ছাড়া কেউ থাকে না। কিন্তু.........।' আবার ইতস্তত করলো মুনির। বললো, 'আমি যে থাকি, তা তো কারো জানার কথা নয়! এক পার্টি ছাড়া কেউ জানে না এটা।' হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো মুনির, 'তাহলে কেউ কি ধরা পড়ে ফাঁস করে দিয়েছে?' ইতস্তত স্বগোতক্তি করে বললো, 'তা কি করে সম্ভব? যে কয়েকজন কমরেড আমার সেল্টার সম্পর্কে জানে, তারা তো অনেক নিরাপদ এলাকায়। তাছাড়া তাদের সঙ্গে রাতে আমরা অনেকক্ষণ কাটিয়েছিই। ওদের কেউ যদি ধরা পড়েও, এতো সহজে মুখ খুলবে না। মরে গেলেও মুখ খোলা অসম্ভব। অথচ এতো তাড়াতাড়ি........!' ইতস্তত করতে থাকলো মুনির।

বেশ গম্ভীর হয়ে আরো কিছুদূর এগুতে থাকলো দু'জন। আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। আশপাশের কোন কোন বাড়িতে ছোট ছেলে-মেয়ের কান্না শোনা যাচ্ছে। ঘুম ভাঙছে সবার।

ঘণ্টা তিনেক পর। একটি নির্জন লেকের ধারে বসে আছে দুই কমরেড। মুখে জ্বলন্ত স্টার সিগারেট। কেউ কথা বলছে না। আক্রোশে শুধু যেন সিগারেটের আগুন রক্তচোখ মেলছে। নিভছে, আর জ্বলছে। তারপর ভেঙে পড়ছে ছাই হয়ে।

হঠাৎ নিরবতা ভাঙলো বিনু, 'পার্টি এলাকায় থাকার সময় কয়েকবার সিক্রেসি আউট হয়েছিল। শেষবার ধরাও পড়েছিলাম। এবার এখানেও সিক্রেসি আউট হলো।' সিগারেটে কড়া টান দিয়ে আবার বললো, 'যাকগে, এ প্রসঙ্গ থাক। অন্য প্রশ্ন করি কমরেড?'

মুনির চেয়ে থাকলো। বিনু বললো, 'আপাতত আমরা তো নিরাপদ। পুলিশ, মিলিটারি এবং পার্টি চ্যানেল থেকেও বিচ্ছিন্ন। সেল্টার থেকে বেরিয়ে আসার পর কারো চ্যানেলেই আমরা নেই।'

'হ্যাঁ কমরেড, এখন আমরা সবার নাগালের বাইরে। নিজেরা পার্টি চ্যানেলে যোগাযোগ না করা পর্যন্ত বিচ্ছিন্নই থেকে যাবো।' জবাব দিলো মুনির।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো বিনু, 'অদ্ভুত জীবন, তাই না?'

পাল্টা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মুনির বললো, 'হ্যাঁ, বিপ্লবীদের জীবনে এটাই নিয়ম। যতোদিন না বিপ্লব আসবে, ততোদিন এভাবেই চলবে। হয়তো গোটা জীবনটাই যাবে এভাবে। এমনও হতে পারে আমাদের জীবনে বিপ্লব এলো না, তখন প্রজন্মকে বিপ্লবের জন্য লড়তে হবে। তারপর একদিন বিপ্লব আসবেই। বিপ্লব অনিবার্য।'

বিনু হাসলো, 'সে তো দীর্ঘ সময়ের কথা। কিন্তু আমাদের পার্টি কি বলে? পার্টি তো বলছে বিপ্লব আমাদের দোড়গোড়ায়। হাত বাড়ালেই ধরতে পারবো। সুতরাং অতো দীর্ঘকালের কথা ভাবছো কেন কমরেড?'

কপাল কুঞ্চিত হলো মুনিরের, 'আমার তা বিশ্বাস হয় না। কিভাবে তা সম্ভব? রাশিয়ায় বিপ্লবের জন্য কতোকাল লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়েছে। চীনে বিপ্লবের জন্য কতোকাল লড়তে হয়েছে। ভিয়েতনামে ৫০ বছর সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হয়েছে। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে আমাদের দেশের মতো মাত্র

৫/৬ বছরের সংগ্রামেই বিপ্লবের আশা করা হয়েছে। বিপ্লব অতো সহজ বলে আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া ....'

থামলো মুনির। নতুন সিগারেট জ্বালিয়ে ঠোঁটে রাখলো। বিনু চেয়ে আছে। আবার মুখ খুললো মুনির, 'সবচেয়ে বড় কথা হলো, বিপ্লবের জন্য যে বিপ্লবী ঐক্য এবং মানুষ দরকার– তা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা জাসদের লোক একাই বিপ্লব করবো– তা কি করে হয়? বিপ্লবের জন্য সমস্ত বামশক্তিগুলোর ঐক্য প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বামপন্থীরা এক একটি দল একে অপরকে চরম শত্রু হিসেবে দেখছি। নির্মূল করছি একে অপরকে। রণনীতি এবং রণকৌশলেও রয়েছে ব্যবধান। এই নীতি আর কৌশলগুলো যদি কারো কারো কাছাকাছি থাকেও, আন্তর্জাতিক সমর্থন নিয়ে রয়েছে ভিন্নতা। দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিকতা প্রশ্নে আমরা একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছি। কোনভাবেই ঐক্যের অবস্থা নেই। এমনকি কারো সেই ইচ্ছা বা চেষ্টাও আছে বলে মনে করি না। সুতরাং বিপ্লবীদের ঐক্যের চিন্তা বাতিল। থাকলাম প্রত্যেকে একা একা। আমরাও একা। বিপ্লবের চেষ্টাটাও তাই এককভাবে করতে হচ্ছে। কিন্তু এখানেও বিপ্লবী মানুষ, বিপ্লবের সংগঠন বা পার্টি থাকা প্রয়োজন– তা নেই। জাসদকে বলা হচ্ছে বিপ্লবী পার্টি প্রক্রিয়ার সংগঠন। পার্টি না গড়া পর্যন্ত আমরা কিভাবে বিপ্লবের আশা করতে পারি? আবার বিপ্লবী পার্টি নেই, অথচ পার্টির সামরিক বাহিনী– তা আছে। অর্থাৎ জাসদের মতো একটা পেটি-বুর্জোয়া পার্টি প্রক্রিয়ার সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে গণবাহিনী চলছে। এটা তো বিধি সম্মত নয়। কমিউনিস্ট রীতি-নীতির কোন নিয়মের মধ্যেই এটা পড়ে না। অথচ তাই-ই চলছে। এর পরিণাম কি হতে পারে– ভেবেছো কমরেড?'

'কি?' চোখের ভাষায় বিনু প্রশ্ন করলো।

'এমনও হয়ে যেতে পারে যে পার্টি গঠনের প্রক্রিয়ায় থেকেও পার্টি গঠন হলো না। জাসদ জাসদই থেকে গেল। কিংবা রণনীতি-রণকৌশল সঠিক প্রমাণিত হলো না। তখন গণবাহিনীর কি হবে? বাহিনীর সদস্যদের হাতে যে অস্ত্র আছে– তা কার নিয়ন্ত্রণে কিভাবে ব্যবহার হবে? এমনও তো হতে পারে যে– এই কারণে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। তখন নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে যাবে গণবাহিনী। এই অস্ত্র তখন আর পার্টি-সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। এই অস্ত্র তখন স্রেফ ডাকাতি করবে, ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার হবে, হত্যা করবে, অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়বে। তখন সামাজিক পরিস্থিতি কি হবে– ভেবে দেখেছো? সেদিন পার্টি-সংগঠনকে রক্ষার এই শক্তিই হয়ে দাঁড়াতে পারে পার্টি-প্রক্রিয়াকে ধ্বংসের শক্তি, পারে বিপ্লবকে ধ্বংস করার শক্তি হয়ে দাঁড়াতে।' বিনুর দিকে তাকালো মুনির। বললো, 'কমরেড, আমার কথাগুলোকে ভিন্নভাবে নিয়ো না। এসব বলছি এই কারণে যে, আমাদের সংগঠন বিপ্লবের জন্য পরিপক্ক হয়নি। সংগঠনে বিপ্লবী ক্যাডার গড়ে ওঠেনি। যারা আছে– তারা সবাই চলছে ভাবাবেগে। অন্ধ বিশ্বাসে। আর নেতৃত্বও অভ্যুত্থান-ক্যু ইত্যাদির ইঙ্গিত দিয়ে– এই বিপ্লব হয়ে গেল বলে সংগঠকদের ভাবাবেগকে ধরে রাখছে। এটা তো রীতিমতো বিপদজনক অবস্থা। এই ভাবাবেগ আর অন্ধ অবস্থার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে যে কোন সময়।'

চুপ করলো মুনির। বিনুও কথা বললো না কোন। নিরবে কাটলো কিছু সময়। যেন দু'জনেই কিছু ভাবছে। নিরবতা ভাঙলো বিনু, '৭ই নভেম্বর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'পার্টির ব্যাখ্যা নিয়ে আমার কিছু দ্বি-মত আছে। এটা বিভ্রান্তিও হতে পারে।' একটু থেমে আবার মুখ খুললো মুনির, 'জাসদ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, ছাত্রলীগ, বিপ্লবী গণবাহিনীর পক্ষ থেকে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সিপাহী-জনতার গণঅভ্যুত্থান শুরু করলো; অথচ এক বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ছাড়া আর কেউ জানলো না? আসলে জাসদ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, ছাত্রলীগ এবং বিপ্লবী গণবাহিনীকে ব্যাপারটা জানানোই হয়নি। না জানিয়ে এ রকম একটা ঘটনা ঘটানো রহস্যজনক নয় কি? কিছু নেতা বা কোন নেতা হয়তো কমরেড তাহেরকে কাজটা করতে বলেছেন, হয়তো তাঁকে এটা পার্টির পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত বলেই জানানো হয়েছে। কমরেড তাহের সরল বিশ্বাসে কাজটা করেছেন। তারপর সরে দাঁড়ানো হয়েছে।

নইলে কমরেড তাহের যখন ক্ষমতা হাতে পেলেন, তখনও তাঁকে সিপাহী-জনতার গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দানের কথা বলতে দেওয়া হলো না কেন? ক্ষমতা গ্রহণ করতে দেওয়া হলো না কেন? কেন জিয়াউর রহমানের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হলো? ক্ষমতা দখলের জন্য অভ্যুত্থান করা হলো– অথচ অভ্যুত্থান করার পর ক্ষমতা নেওয়া হলো না! সংগঠনকে অভ্যুত্থানের কথা প্রয়োজনের সময় জানানো হলো না! তাহলে কেন এটা করা হলো? কেন?? কার স্বার্থে??? যদি বলি এটা কোন বিপ্লবের জন্য করা হয়নি, অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল– তাহলে কি ভুল হবে?'

'তোমার কি মনে হয়? কার স্বার্থে এটা করা হলো?' প্রশ্ন করলো বিনু।

'এর পিছনে অনেক রহস্য থাকা বিচিত্র নয়। একে রহস্য না বলে আমার বলতে ইচ্ছে করে ষড়যন্ত্র। না হলে ৭ই নভেম্বরের এই অভ্যুত্থান ঘটানোর আগে ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্টে যে প্রচারপত্র বিলি করা হচ্ছিলো, তার মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রচারপত্র থাকলো কি করে? প্রায় একই ভাষায় একই লক্ষ্যে খন্দকার মোশতাক-রাজাকার-আলবদর-জামায়াত সমর্থকদের প্রচারপত্র বিলি হলো কেন? তাদের সমর্থক সৈন্যরাই বা আমাদের সৈনিক সংস্থার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কেন? অভ্যুত্থানের আগে যখন সমান্তরালভাবে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র কাজ করছিল, তখন কি আমাদের হাইকমান্ড তা জানতে পারেনি? না জানাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঘটনাটা ঘটানোর স্বার্থে হয়তো সব জেনেও তারা চুপ করে ছিলেন। কমরেড তাহেরকেও এসব তথ্য জানতে দেওয়া হয়নি। জানলে তিনি কখনই অভ্যুত্থান করতেন না। আসলে গোটা ব্যাপারটাই রহস্যজনক। বিশেষ কোন লক্ষ্য নিয়েই এসব ঘটেছে বলে আমার মনে হয়। সৎ লক্ষ্য ছিল বলে আমার বিশ্বাস হয় না।'

'তোমার কি মনে হয় যে– কমরেড তাহেরকে আমরা আবার ফিরে পাবো?'

'মনে হয় না। তাহেরকে ওরা হত্যা করবে। স্রেফ গুলি করে বা ফাঁসী দিয়ে হত্যা করবে। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল জিয়াউর রহমানের সরকার কোন বিপ্লবীকে বাঁচিয়ে রাখবে না। বিপ্লবীদের নির্মূল করার জন্যই জিয়া ক্ষমতা নিয়েছে। দেখছো না– সারা দেশে এই ক'মাসে কতো হাজার বিপ্লবীকে হত্যা করা হলো! কিভাবে সারাদেশে নির্মূল অভিযান চালানো হচ্ছে! জেলখানাগুলোতে তিল ধারনের জায়গা নেই।'

বিনু মুখ খুললো, 'হুঁ, আমারও একই ধারণা। ৭ই নভেম্বরের ঘটনা থেকে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে– গোপানে যেসব বামপন্থীরা সমাজ বিপ্লবের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন, তারা প্রকাশ হয়ে পড়েছেন। কী সেনাবাহিনী, কী জনগণ– সবখানেই এই প্রকাশটা ঘটে গেছে। আর এই প্রকাশ হয়ে পড়া বিপ্লবীদের এখন নির্মূল করা হচ্ছে। হাইকমান্ডের আরেকটি ব্যাখ্যা নিয়ে আমার খটকা কি– জানো কমরেড?'

'কি?'

'৩রা নভেম্বর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলো, সেটাকে আওয়ামী-বাকশালী বা রুশ-ভারতের এজেন্টদের অভ্যুত্থান বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের হাইকমান্ডও তাই-ই বলে, প্রতিক্রিয়াশীল-রাজাকার-আলবদররাও তাই-ই বলে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফকে বলা হয়েছে ভারতপন্থী। কিন্তু বাস্তবে তো তা নয়। তিনি তো কট্টর ভারতবিরোধী ছিলেন। এমনকি তিনি আওয়ামী লীগের সমর্থকও ছিলেন না। তার পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনরা হয়তো আওয়ামী লীগের লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি তো ছিলেন না। খালেদ মোশারফ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে চীনা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একজন নির্ভেজাল সমর্থক। অথচ তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো এবং হত্যা করা হলো। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন– এটাই কি তাঁর অপরাধ?'

'ঠিক, আমার কথাটাই তুমি বলেছো কমরেড। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এগুলো। এসব মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু–' থামলো মুনির। বললো, 'কিন্তু হাইকমান্ডের তত্ত্বের কাছে এগুলোকে দাঁড় করানো যায় না। আবার বেশি বলতে গেলে আমরাই খারাপ হয়ে যেতে পারি।' হাসলো মুনির। বিনুও হাসলো ওর কথায় সমর্থন দিয়ে।

সূর্য্যের তেজ বেড়েছে। লেকের ধারে বেশকিছু গরীব ধরনের মানুষ আসা-যাওয়া করছে। পিচ্চিদের একটা দল পানিতে নেমে লাফালাফি করছে। সেদিকে তাকিয়ে মুনির বললো, 'মাঠ পর্যায়ের রাজনীতি যে চেইন অব কমান্ডে চলছে– সেই কমান্ড ভুল করলে মহাবিপদ। একটা পরিবারের কর্তা ভুল করলে একটা পরিবারকে পস্তাতে হয়। কিন্তু এখানে ভুল হলে দেশের গোটা রাজনীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে পস্ত াতে হবে। সেটাই হচ্ছে কিনা কে বলবে!'

দু'জন আবার দুটো সিগারেট ধরালো। এই দফাই শেষ। আর নেই। খালি প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো মুনির, 'জিয়াউর রহমান বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতা দখল করেছে। তারপর তার জীবনদাতা এবং সেইসঙ্গে ক্ষমতাদানকারী কর্নেল (অবঃ) তাহেরকে গ্রেফতার করেছে। জাসদের প্রায় সব নেতাকেও জেলে পাঠানো হয়েছে। দেশের জেলখানাগুলো এখন রাজনৈতিক বন্দিতে ভর্তি। তিল ধারনেরও জায়গা নেই। যারাই গণতন্ত্রের দাবিতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলছে– তাদেরই জিয়াউর রহমান জেলে পুরছে। সারাদেশে চালানো হচ্ছে সামরিক সন্ত্রাস, হত্যা, গুম এবং ধ্বংসযজ্ঞ। কেউ যাতে আর গণতন্ত্রের দাবি করতে না পারে, কিংবা শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার কথা বলতে না পারে– সে জন্য সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুর জিয়াউর রহমান সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কিন্তু এই রাজনীতির খেলাটা কোথায় জানো কমরেড?'

'কোথায়?' প্রশ্ন করলো বিনু। মুনির বললো, 'খেলাটা হলো– এই গণতন্ত্রবিরোধী জিয়াউর রহমানকে একদিন গণতন্ত্রের মুক্তিদাতা, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা বলে প্রতিষ্ঠা করা হতে পারে। আমরা যদি ব্যর্থ হই, তাহলে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দালালরা একদিন তাকে এভাবেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে। তুমি দেখে নিয়ো।'

'অসম্ভব নয়। বুর্জোয়া রাজনীতি হলো প্রহসনের রাজনীতি। প্রহসন আর মিথ্যাচার করে জনগণকে কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত করা তো যেতেই পারে। যেহেতু প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে ক্ষমতা আছে, সেহেতু অনেক কিছুই সম্ভব'– বিনু বললো। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো দু'জনেই। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো একে একে। বিনু বললো, 'অনেক বেলা হয়ে গেল। এখন কি চিন্তা করছো কমরেড?'

একটু ভেবে মুনির বললো, 'তেমন কিছু চিন্তা করিনি। তবে ঠিক দুপুরের পর সেল্টারের খোঁজ নেবো। তারপর চলে যাবো জয়দেবপুর এলাকায়। সেখান থেকে পার্টি চ্যানেলে সংযোগ করবো, তার আগে নয়। তুমি আমার সঙ্গে জয়দেবপুর যাবে। সেখানে দু-একদিন থাকার পর সাংগঠনিক এলাকায় যেও। অসুবিধা হবে?'

বিনুও ভাবলো একটু, 'না, অসুবিধা হবে না। তবে সেল্টারের খোঁজ নেবে কিভাবে? রেইড করা এলাকায় যোগাযোগ করা কি ঠিক হবে?'

'এক পিচ্চিকে পাঠাবো। নাম পিনু। ওয়ার্কশপে কাজ করে। সেও আমাদের কমরেড। তবে কেউ তা জানে না। সামনেই ও থাকে।'

'তাহলে আর দুপুর পর্যন্ত দেরী কেন? এখনই খোঁজ নাও।'

হাসলো মুনির, 'রেইড করা এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক। তাছাড়া দুপুরের পর অবস্থাটা নিরাপদ হতে পারে।'

- পিনু গিয়ে আবার বিপদে পড়বে না তো?
- না, পড়বে না। খুব চালাক এবং সতর্ক। তাছাড়া পিনুর বয়স কতো জানো?
- কতো?
- ৭/৮ বছর হবে। কারো সন্দেহ করার উপায় নেই।
- ও। কিন্তু এতো সময় কি এখানেই বসে থাকবো?

- না, এখনই উঠবো। সিগারেটও ফুরিয়ে গেল। কিনতে হবে। আপাতত একটা চায়ের দোকানে গিয়ে চা খাবো। সিগারেট টেনে হাঁটতে থাকবো। তারপর পিনুর সঙ্গে যোগাযোগ করে অমরা খেয়ে নেবো। তারমধ্যে ও ঘুরে আসতে পারবে।

আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলো দুই কমরেড। বাচ্চাদের ঝাঁপাঝাঁপি দেখলো। যে গাছটির নিচে বসেছিল, তার ওপর কয়েক ঝাঁক পাখির হরেক রকম গান শুনলো। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়ালো দু'জন। নিঃশব্দে পা বাড়ালো পথে– যে পথের সামনে কোন্ অবস্থা বিরাজ করছে, তার কিছুই জানে না ওরা। শুধু জানে সামনে আছে শুধু লড়াই আর লড়াই।

(নয়)

অন্ধকার রাত। গ্রামের মেঠোপথ ধরে আসছিল দু'টো ছায়ামূর্তি। থেমে দাঁড়ালো হঠাৎ। সতর্ক চোখে সবদিক খেয়াল করলো। কান পেতে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর শরীরের পেছন দিক থেকে একজন টেনে বের করলো রিভলবার। বাড়িয়ে ধরলো অপরজনের দিকে, 'তোমাকে আর আসতে হবে না। একাই যেতে পারবো। এটা নিরাপদে রাখবে।'

অপরজন হাতে নিলো অস্ত্রটি। তারপর পিছনের দিকে গুজে রাখলো। বললো, 'যেতে অসুবিধা হবে না তো?'

'না, হবে না। সাবধানে থেকো সবাই। লাল সালাম। লং লীভ রেভ্যুলিউশন।' জবাব দিয়েই অন্ধকারে পা বাড়ালো ছায়ামূর্তি। অপরজন বিপরীত দিকে ঘুরতে ঘুরতে স্বগোতক্তি করলো, 'লাল সালাম কমরেড, লং লীভ রেভ্যুলিউশন।'

সঙ্গীকে অস্ত্র তুলে দিয়ে যে ছায়ামূর্তিটি হাঁটছে, তার নাম বিপ্লব। বিনুর সহকর্মী। বিপ্লব অন্ধকারে গ্রামের ফসলী ক্ষেতে নেমে এসেছে। হাঁটছে দূরের একটা বসতি এলাকা লক্ষ্য করে। আসলে ও চলেছে নিরাপদ একটা সেল্টারে। হাঁটতে হবে অনেক দূর। প্রায় ৫ মাইল। এই পথের অনেকটাই জনবসতিহীন ফসলী ক্ষেত। পরিচিত পথ। তাই নিশ্চিন্তে হাঁটছে বিপ্লব।

ও এই এলাকায় এসেছিল দিনের বেলায়। মোটিভেশন ওয়ার্কসহ কয়েকটি পলিটিক্যাল ক্লাশ করিয়েছে এর মধ্যে। সন্ধ্যার পর পার্টি ওয়ার্কারদের নিয়ে বসেছিল। নতুন কিছু কর্মসূচি ঠিক করেছে। তারপর গভীর রাতে রওনা দিয়েছে আরেক সেল্টারে। এই গ্রামেই রাত কাটিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু আগামীকাল বিনু আসবে ঢাকা থেকে। আজই মেসেজ পেয়েছে। বিনু ভাইকে রিসিভ করতে হবে। সেজন্য সামনের এলাকায় যেতে হচ্ছে।

ক্ষেতের আইল ছেড়ে মাঝে মাঝেই বিপ্লবকে মেটোপথে উঠতে হচ্ছিলো। অর্ধেক পথ পেরিয়েছে। আর আড়াই-তিন মাইল। তারপর এলাকায় ঢুকে পড়বে। সামনের সেল্টার আসলে মুক্তএলাকা। পার্টি এখানে প্রশাসন চালায়। যৌথখামার ব্যবস্থায় কৃষি কাজ হয়। এলাকায় কোন অশান্তি নেই। ধনি-গরীব বলে ভেদাভেদ নেই। সবাই কাজ করে, সবাই শ্রমের ফল ভোগ করে। কেউ বসে থাকে না। কেউ অসচেতন অশিক্ষিতও নয়। মুক্তএলাকা বলে মাঝে-মধ্যে এখানেও মিলিটারি বা পুলিশ হানা দেয়। তবে তেমন কোন সুবিধা করতে পারে না। অযথা কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়– এই যা। বিপ্লবীদের জন্য সব এলাকাই অবশ্য মুক্তএলাকা ধাঁচের। কোন কোনটি পুরো সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিচালিত, আবার কোন কোনটি আধা বা সিকি পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত। আসলে ধনি আর গরীবের জটিলতা যায়নি। তবে প্রক্রিয়া চলছে সেই লক্ষ্যে। এই সমস্ত দ্বন্দ্বময় এলাকাগুলোতে ধনিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে ভিতরে ভিতরে

চলছে একটা যুদ্ধ। ভীত-সন্ত্রস্ত ধনিরা অবশ্য প্রকাশ্যে কোন রকম বিরোধীতা করে না। গোপনে গোপনে শত্রুপক্ষের কাছে নানা তথ্য পাঠায়। জটিল অবস্থাকে মেনে নিয়েই চলছে বিপ্লবীদের সামাজিক বিপ্লবের রাজনীতি।

ক্ষেতের আইল ছেড়ে মেটোপথে পা দিলো বিপ্লব। সামনে একটা অশ্বত্থ গাছ। বহুকালের পুরনো। কতোদিনের কে জানে। ওই গাছটার পাশ দিয়ে ডান দিকে চলে গেছে পথ। বিপ্লব পা বাড়ালো। কিন্তু বাঁক ঘুরতেই চমকে উঠলো।

দু'টো ছায়ামূর্তি সামনে এসে দাঁড়ালো। হাতে অস্ত্র। পিছন দিক থেকেও অস্ত্র চেপে ধরলো পিঠে। ছায়ামূর্তির একজন বললো, 'হাত তুলে দাঁড়াও বিপ্লব। নড়াচড়া করো না।'

বিপ্লব হাত তুললো। ছায়ামূর্তির একজন ওর দেহ সার্চ করলো। তন্নতন্ন করে খুঁজলো কিছু। এক সময় বললো, 'কিছু নেই কমরেড।'

জবাব এলো, 'নেই? অসম্ভব!' উত্তরদাতা ছায়ামূর্তি নিজেই এগিয়ে এলো। তন্নতন্ন করে আবার সার্চ করলো ওকে। শেষে বললো, 'জিনিস কোথায়?' বিপ্লব জবাব দিলো না। এবার দু'জন ছোট টর্চ লাইট জ্বালিয়ে মাটি হাতরাতে লাগলো। কাছের ছায়ামূর্তিটি আবার বললো, 'জিনিস কোথায় বিপ্লব?'

বিপ্লব মুখ খুললো, 'তোমরা কারা?' জবাবে ছায়ামূর্তি বললো, 'আমরা পার্টির লোক।' বিপ্লব আবার প্রশ্ন করলো, 'কোন্ পার্টি?' 'ইপিসিপি, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইস্ট পাকিস্তান।' জবাব পাওয়া গেল। বিপ্লব বললো, 'কোন জিনিস নেই।'

বিপ্লবের হাত বেঁধে ফেলা হলো পিছন দিকে। চোখ বাঁধা হলো। তারপর হাঁটতে বলা হলো। পথ দেখতে পাচ্ছিলো না বলে মুখোশধারীদের দু'জন দু'পাশে ধরে রেখে সহযোগিতা করলো। হাঁটছে ওরা। মুখোশধারীরা সংখ্যায় ৬/৭ জনের কম নয়। কোন্ দিকে হাঁটিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো– বুঝতে পারলো না বিপ্লব।

অনেকক্ষণ কথা বলেনি কেও। বিপ্লব মাঝে মাঝে প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছিল। থামিয়ে দিয়েছে ওরা। আধ ঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে। পায়ের নিচে মেঠোপথ বলেই মনে হচ্ছে। এবার মুখোশধারীরা মাঝে মাঝে থামতে লাগলো। নিজেদের মধ্যে কথা বললো। বিপ্লব কিছু বুঝতে পারলো না। আবার চলতে থাকলো ওরা। মাঝে মাঝে বিপ্লব প্রশ্ন করতে থাকলো। উত্তর দিচ্ছে মুখোশধারীদের একজন। আরো আধ ঘণ্টা হাঁটলো সবাই। এরমধ্যে কিছু কথা হয়েছে। কথাগুলো এই রকম ঃ-

- আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?
- পরে জানতে পারবে।
- কি চাও তোমরা?
- ওটাও পরে জানবে।
- জানো, এভাবে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরিণতি কি হতে পারে? তোমাদের কঠিন খেসারত দিতে হবে।
- জানি।
- সব কিছু জেনেও ঝুঁকি নিয়েছো?
- হ্যাঁ, বিপ্লবীদের জন্য ঝুঁকিই জীবন।
- বিপ্লবী! থু! কীসের বিপ্লবী তোমরা?

কোন জবাব নেই। আবার অনেকক্ষণ হাঁটতে হয়েছে। খুব শক্ত করে চোখ এবং হাত বাঁধায় অসুবিধা হচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। হাতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই হোঁচট খাচ্ছে। কিন্তু হাত ধরে রাখা দুই মুখোশধারী পড়ে যেতে দিচ্ছে না।

- বিপ্লবী! তাহলে চোর-ডাকাতের মতো মুখোশ পরে থাকো কেন? ভয় পাও?

জবাবে কয়েকজন একসঙ্গে হাসলো। একজন বললো, 'তোমরা মনে হয় খুব সাহসী? তাহলে পালিয়ে বেড়াও কেন?'

একটু ভেবে বিপ্লব বললো, 'আমরা পুলিশ-মিলিটারি ছাড়া কাওকে দেখে পালিয়ে বেড়াই না।'

- আমরাও। তবে সাম্রাজ্যবাদের দালালরা পুলিশ-মিলিটারি থেকে কম নয়। বরং বেশি।'
- কে সাম্রাজ্যবাদের দালাল? আমরা?
- তোমরা আধিপত্যবাদের দালাল। তোমরা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল। তোমরা প্রতিবিপ্লবী। জনগণের প্রথম শ্রেণীর শত্রু।
- অসম্ভব।
- সম্ভব, এবং সেটাই সত্য।
- এ জন্যই কি ধরে নিয়ে যাচ্ছো?
- হয়তো!

আবার কিছুক্ষণ মুখ বন্ধ করে হাঁটলো সবাই। বিপ্লব কথা বললো পূণরায়–

- আমাকে কি হত্যা করবে?
- সময়েই জানতে পারবে।

আবার হাঁটলো ওরা। পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে। প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর ওরা নতুন একটা জায়গায় পৌঁছালো। বিপ্লব পায়ের নিচে নরম বালিমাটির ছোঁয়া অনুভব করলো। পা সামান্য বসে যাচ্ছে। ফাঁকা অথচ একটা গর্জন মতো শব্দ আসছে। ও বুঝতে পারলো ক্রমেই নদীর দিকে যাওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যত পরিণতি অনুভব করতে পারছে। উদ্বেগ চাপা রাখার জন্য কথা বলে যাচ্ছে বিপ্লব।

- তোমরা তো বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করো না।
- কেন এমন কথা মনে হলো?
- তোমাদের দলের নামের সঙ্গে বাংলাদেশ নেই, আছে পূর্ব পাকিস্তান!
- হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। আমরা কারো দয়ায় পাওয়া স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি না। আমরা আধিপত্যবাদী ভারতকে আমাদের শত্রু মনে করি।
- তার মানে এদেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-যুবক-যুবতী যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল– তা মিথ্যা? তাঁদের যুদ্ধের কোন দামই নেই?
- হয়তো আছে, তবে তারা সবাই ছিল আধিপত্যবাদের দালাল।
- রাজাকার-আলবদররাও তাই-ই বলে। মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক চক্রগুলোও এ কথা বলে। তারমানে তোমরাও ওদের মতো?
- কখনও নয়। আমরা মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করি। তারা বিপ্লবের চীর শত্রু।
- হ্যাঁ, শত্রু বটে! তবে দর্শনে অমিল নেই।

আবার কিছু সময় চুপচাপ থাকলো ওরা। হাঁটছেই। বেশ কিছু পরে বিপ্লব বললো, 'অনেক দূর চলে এলাম। চোখটা খুলে দিলে কি অসুবিধা হবে? হাত তো বাঁধাই আছে। অপরিচিত জায়গায় পালাতে পারবো না। এতো ভয় পাচ্ছো কেন?'

বিপ্লবের কথা শুনে মুখোশধারীরা নিজেদের মধ্যে সংকেত বিনিময় করলো। এখন অবশ্য মুখোশ পরা নেই কারো। খুলে ফেলেছে অনেক আগেই। ওদের মধ্যে যিনি কমান্ডার ছিলেন, তিনি ইঙ্গিত করতেই একজন এগিয়ে এলো। বললো, 'খুব কি অসুবিধা হচ্ছে?'

'শক্ত করে বেঁধেছো। মাথায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে'– জবাব দিলো বিপ্লব। এরপর বাঁধন খুলে গেল। প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না ও। বেশ কিছুক্ষণ পর সবকিছু স'য়ে এলো। অন্ধকার রাত। তারার আলোয়ই যতোটুকু দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া সামনে ধু ধু অন্ধকার। নদীর গর্জন ভেসে আসছে।

কথা বললো বিপ্লব, 'জানি আমাকে হত্যা করবে। ভারতের দালাল– এটাই কি শুধু আমার অপরাধ?'

জবাবে একজন বললো, 'না, শুধু একটা অপরাধ নয়। তুমি এবং তোমার দল শ্রেণীশত্রু। শ্রেণীশত্রুদের ক্ষমা নেই।'

'আমি তো ক্ষমা চাইনি। কিন্তু আমরা শ্রেণীশত্রু– তা কিভাবে ঠিক করলে?'

'এ দেশে বিপ্লবের স্তর হলো জনগণতান্ত্রিক। আধা-সামন্ততান্ত্রিক এই সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী-সংগ্রাম এবং জনযুদ্ধই হলো বিপ্লবের উপায়। তোমরা তা মানো না। তোমরা বিপ্লবের নামে ভুল ব্যাখ্য দিয়েছে, শ্রেণীশত্রুদের হাতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছো।'

'যেমন?'

'যেমন তোমরা বলেছো, বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক। প্রকৃত স্তরকে ডিঙিয়ে তোমরা ভ্রান্ত তত্ত্ব দিয়েছো। তোমাদের তত্ত্ব, বিপ্লবকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রতিবিপ্লবী হিসেবে তোমরা কাজ করছো। কাজেই তোমরা শ্রেণীশত্রু।

'এটা ব্যাপক অনুশীলন প্রক্রিয়ার বিষয়। কার পার্টি-লাইন সঠিক, আর কার বেঠিক– সেটা এই অনুশীলন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে প্রমাণ হবে। আমাদের লাইনও ভুল হতে পারে, তোমাদের লাইনও ভুল হতে পারে। আবার আরো যারা বিপ্লবের নামে কাজ করছে, তাদেরও ভুল হতে পারে। এটা কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়। আবার কারো না কারো লাইন ঠিকও হতে পারে। এটা নির্ভর করবে ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে দেখার মধ্যদিয়ে। সুতরাং তোমরা আগেই কি করে তোমাদের লাইনকে সঠিক মনে করছো? তাছাড়া সব বামপন্থী দলই যদি তাদের নিজেদের আলাদা আলাদা লাইনকেই সঠিক মনে করে এবং অন্যদেরটা ভুল মনে করে, তাহলে বিপ্লবী ঐক্য হবে কিভাবে? বিপ্লবীরা নিজেরাই যদি নিজেদের দ্বন্দ্বে খতম হতে থাকে– তাহলে বিপ্লব কোনদিন হবে কি?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো না কেউ। কিছুক্ষণ পর একজন বললো, 'তোমার কথায় হয়তো যুক্তি আছে। কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে– আমরাই সঠিক। তাছাড়া পার্টি-সিদ্ধান্তে আমরা বিশ্বাসী। সুতরাং আমরা কোন ভুল করছি না।'

পাশে গর্জনমুখর নদী। তীরের ঠাণ্ডা আর নরম বালি মাটির উপর দিয়ে হাঁটছে। ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, গাঢ় অথচ শক্তিশালী বাতাসকে ঠেলে চলছে। বিপ্লব নিশ্চিত হয়ে গেছে নিজের ভাগ্য সম্পর্কে। তবু মাঝে মাঝে কথা বলছে।

একজন বললো, 'তোমরা আমাদের কয়েকজন কমরেডকে হত্যা করেছো। ঠিক তুমি নও, তোমার দলের লোকেরা করেছে। তুমি হত্যাকারী দলের একজন। সুতরাং এখানেও তুমি অপরাধী।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললো না বিপ্লব। একটু ভেবে বললো, 'তোমরাই আগে হত্যার রাজনীতি শুরু করেছো। আমরা যখন রাজনীতি শুরু করি তখন আমাদের প্রধান টার্গেট ছিল সরকার, তোমরা নয়।

অথচ তোমরা একে একে হত্যা করতে থাকলে আমাদের। কয়েক'শ কমরেডকে হত্যা করেছো তোমরা। সে তুলনায় আমরা কিছুই করিনি। তোমাদের লোক হারানোর জন্য তোমরাই দায়ি, আমরা নই।'

জবাব দিলো না কেউ। বিপ্লবকে ধরে নিয়ে যাওয়া দলটি এখন নদীর একেবারে কাছে দিয়ে হাঁটছে। ওদের নেতা সবার আগে। দলের লোকদের হাতে ছোট-বড় নানান অস্ত্র চোখে পড়ছে। বড় অস্ত্রের মধ্যে ব্রেটাগান, কারবাইন রয়েছে। বিপ্লবের চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। এখন সব দেখতে পাচ্ছে। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো ওর। তবু ভাবছিল কি করে পালানো যায়। হাত বাঁধা না থাকলে ভাল হতো। দু'টো হাতই রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে ভারী বস্তুর মতো লটকে আছে। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে সংযোগ স্থলগুলো। কথা বলে সুযোগের সন্ধান করছে বিপ্লব।

- আমি যে ওই পথ দিয়ে আসবো– তোমরা জানলে কি করে?

জবাবে হাসলো একজন। বললো, 'আমরা শুধু তোমাকে নয়, তোমার সঙ্গে আরো দু'জনকে আশা করেছিলাম। সঙ্গে হাতিয়ারও আশা করেছিলাম। কি করেছো?'

বিপ্লবও হাসলো, 'ছেড়ে এসেছি।'

- সঙ্গের দু'জন কোথায়?
- ওরাও একে একে ছেড়ে গেছে।
- হাতিয়ার কার কাছে রেখেছো?
- এ জবাব কোন যুক্তিতে আশা করছো?

জবাব পাওয়া গেল না প্রশ্নের। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার কথা বললো বিপ্লব, 'হাত জোড়া অচল হয়ে গেল। খুলে দেওয়া যায় না?'

- ওটা আর সচল হতে দিয়ে লাভ কি? সময় তো শেষ।
- মানে?
- মানে বুঝবে এক্ষুণি। একটু অপেক্ষা করো।

মরিয়া হয়ে চিন্তা করতে লাগলো ও। ডান দিকে অথৈ নদী। সামনে-পিছনে-বামে ধু ধু মাঠ। কোথাও কোন জনবসতি নেই। নদীতে কোন নৌকাও নেই। চিৎকার করলেও শুনবে না কেও। ভুল করে ফেলেছে ও– মনে মনে ভাবলো। আরো আগে সুযোগের চেষ্টা করা উচিত ছিল।

অকস্মাৎ থেমে পড়লো দলটি। এমন একটা জায়গায় থামলো, যেখানে আরো প্রতিকূল অবস্থা। নদীটা বাঁক নেওয়ায় তৈরি হয়েছে বড় একটা ভাঙনক্ষেত্র। পাড়টাও অনেক উঁচুতে। অর্থাৎ বামদিকে যাবার পথ বন্ধ। আর সামনের দিকটা ভাঙনে ভাঙনে বিশৃঙ্খল। ওটাও সুবিধজনক পথ নয়। তার ওপর পড়ে আছে একটা বিরাট আকারের কাঠের গুড়ি। বিপ্লবকে সেই গুড়িতে বসানো হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পা জোড়া একসঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো। পালানোর যেটুকু উপায় ছিল তাও শেষ হয়ে গেল। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো বিপ্লবের। ভয় পাওয়া চলবে না কিছুতেই।

হঠাৎ প্রশ্ন করলো একজন, 'ভয় পেয়েছো বিপ্লব?'

জবাবে দৃঢ়ভাবে বললো, 'কোন বিপ্লবী কখনও ভয় পায় না। সাহসই তাঁদের জীবনধর্ম।'

'থ্যাঙ্কু, সেটাই আশা করেছিলাম।'

এবার ওদের কমান্ডার এগিয়ে এলো। মুখটা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে বেশ দৃঢ় এবং কঠোর মনে হলো। লোকটা পকেট থেকে সিগারেট বের করলো। ম্যাচ জ্বেলে ধরালো। মুখের হাড়গুলো বেরিয়ে

আসা, গোঁফ আছে। ম্যাচের আলোয় ওইটুকুই দেখতে পেলো বিপ্লব। একটা সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে বললো, 'সিগারেট নাও।' ঠোঁটে গুঁজে দিতে চাইলো। বিপ্লব ফেলে দিলো। বললো, 'হাত-পা বাঁধা অবস্থায় টানতে পারবো না। দুঃখিত।' কমান্ডার লোকটিও পাল্টা দুঃখ প্রকাশ করলো। বললো, 'সরি, বাঁধন খুলতে পারছি না।'

লোকটা পাইচারি করলো। হাত উঁচিয়ে ঘড়ি দেখলো। তারপর শুরু করলো–

- বিপ্লব?
- বলুন।
- এখানে কেন নিয়ে আসা হলো, তোমার জানা দরকার।

পাইচারির সঙ্গে কয়েকটান সিগারেট পান করলো কমান্ডার। তারপর আবার শুরু করলো।

- তোমরা এই অঞ্চলে আমাদের ৪ জন কমরেডকে হত্যা করেছো। আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছো। তোমরা মুৎসুদ্দি দালাল বুর্জোয়া এবং সামন্তবাদের স্বার্থরক্ষা করছো। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধীতা করছো। তোমরা প্রতিবিপ্লবী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের দালাল। তোমরা বিপ্লব ও জনগণের শত্রু। তাই–

আবার সিগারেটে টান দিলো কমান্ডার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিপ্লবকে পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর বললো, 'পার্টি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এই মৃত্যুদণ্ড এখন আমরা কার্যকর করতে যাচ্ছি। তোমার কোন বক্তব্য থাকলে বলতে পারো।'

হো হো করে হাসলো বিপ্লব। বললো, 'আমরাইতো তোমাদেরকে বিপ্লব ও জনগণের শত্রু বলে মনে করি। তোমাদের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল মনে করি। পাকিস্তান তোমাদের অস্ত্র আর প্রশিক্ষণ দেয়। তোমরা লাল পতাকা দিয়ে লাল পতাকা ধ্বংস করছো। শ্রেণীশত্রু এবং প্রতিবিপ্লবী তো তোমরাই। উল্টো আমাদেরই প্রতিবিপ্লবী বলতে শুরু করেছো! চমৎকার, অতি চমৎকার!'

কঠোর হয়ে উঠলো কমান্ডারসহ বাকি সকলের মুখ। কমান্ডার সিগারেটে পরপর কয়েকটি টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর পাইচারি শুরু করলো। হঠাৎ ঝুঁকে এলো বিপ্লবের দিকে।

- বিপ্লব
- শুনছি
- তুমি কি বাঁচতে চাও?

ভিতরে ভিতরে চমকে উঠে জবাব দিলো–

- কিভাবে?
- যদি সব তথ্য জানাও এবং আমাদের দলে যোগ দাও.......
- তথ্য? কিসের তথ্য?
- তোমাদের অস্ত্রগুলোর সন্ধান দিতে হবে, পার্টি-পরিকল্পনা বলতে হবে এবং সেল্টার ও ক্যাডারদের পরিচয় জানাতে হবে। জানাবে?

আবার হাসলো বিপ্লব। বললো, 'এসব জানালে কি ছেড়ে দেবে আমাকে?'

- সত্যি কথা বললে ছেড়ে দিতে পারি।
- কী করে বুঝবে যে সত্যি কথা বলছি?
- বুঝবো। কারণ আমাদের কাছেও অনেক তথ্য আছে। মেলাতে গেলেই সত্য-মিথ্যা ধরে ফেলবো।

চুপ করে থাকলো ও। কমান্ডার তাকিয়ে থেকে বললো, 'কী ভাবছো? বলবে? বলে দাও এবং আমাদের সদস্য হয়ে যাও। সত্যিকারের বিপ্লব করতে পারবে জনগণের জন্য। কি? বলবে?'

হাসলো বিপ্লব, 'না, আমাদের কারো কাছ থেকে কোন অবস্থাতেই তথ্য পাবে না। পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার লোক আমরা নই। ভুল করছো তোমরা।'

গম্ভীর হলো কমান্ডার, 'হুম। শেষ সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হচ্ছে না। দুই মিনিট সময় দিলাম। ভেবে দেখো। বলে দাও আর্মসগুলো কোন্ কোন্ সেল্টারে আছে এবং কোথায় কোথায় সেল্টার?'

আবার হাসলো বিপ্লব, 'দুই মিনিট কেন, অনন্তকাল সময় দিলেও লাভ হবে না। বিপ্লবীরা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না, মুত্যুকে ভয় পায় না। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।'

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

দৃশ্য পরিস্কার। পরের দিন উত্তাল নদীতে একটা গলাকাটা লাশ ভেসে যাচ্ছিলো। লাশটা জাসদের নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক বিপ্লবের।

(দশ)

.... প্রায় তিন বছর পর। এরমধ্যে বিনুদের চোখের সামনে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। ওদের শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড তাহেরকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। আসলে সামরিক শাসন জারি করে এই স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মাটিতে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেওয়া হয়েছে। এক ভয়ঙ্কর নির্মূলন অভিযান চালানো হয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর স্টাইলে। নীল নকশামত চলেছে সব কাজ।

নির্মূল ও হত্যার মহোৎসব চলেছে সমাজবিপবের সকল ক্ষেত্রসহ বেসামরিক পর্যায় এবং সামরিক বাহিনীর ভেতরে। সামরিক বাহিনীতে একের পর এক 'অভ্যুত্থান' হয়েছে। আসলে এর প্রায় সবই ছিল সাজানো, পরিকল্পিত এবং এজেন্ডাভিত্তিক। এই নাটকের মধ্যদিয়ে সেনাবাহিনীতে চালানো হয়েছে পৈশাচিক শুদ্ধি অভিযান। আগে বাছাই করা হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের মতাদর্শের সদস্য এবং সত্যিকারের দেশপ্রেমিকদের। তারপর 'অভ্যুত্থান' তৈরি করে তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে অথবা ফায়ারিং স্কোয়াডে এঁদের করা হয়েছে হত্যা। এই যজ্ঞের শিকার হয়েছে সামরিক বাহিনীর হাজার হাজার সদস্য। শুধু হত্যাযজ্ঞই হয়নি– হয়েছে গুম, জেল, চাকরিচ্যুতি এবং বিতাড়ন। যারাই একটি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের চিন্তাকে লালন করেছে এবং পাকিস্তানি আদল থেকে বেরিয়ে '৭১-এর জনগণমুখী মুক্তিবাহিনী বা গণবাহিনীর মতো একটি জনকল্যাণমূলক সামরিক বাহিনীর প্রত্যাশা করেছে– তাদের সবাইকে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে। হয়েছে জনযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের সশস্ত্রবাহিনীকে গণবিমূখ, ক্যান্টনমেন্টে আটকে থাকা জনবিচ্ছিন্ন এবং সাম্রাজ্যবাদের অনুগত করার করার কাজ। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এই অভয়ারণ্য গড়ে তোলার কাজটি করা হয়েছে সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে।

ঠিক একই এজেন্ডায় নির্মূলযজ্ঞ চলানো হয়েছে বেসামরিক পর্যায়ে। 'সন্ত্রাস নির্মূল' 'বে-আইনি অস্ত্র উদ্ধার' এবং 'দুস্কৃতকারী' দমনের নামে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করা ছাড়াও কাটা দিয়ে কাটা তোলা বা লাল পতাকা দিয়ে লাল পতাকা নিধনের নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের মতাদর্শকে সমূলে ধ্বংসের। তাই অবিরত রক্তের বন্যায় রঞ্জিত হয়েছে সবুজ-শ্যামল

মাটি। খতম হয়েছে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক মানুষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছে জেল-জুলুম এবং পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার। দমননীতির স্টিম রুলার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে স্বপ্নবান মানুষের সকল স্বপ্নসহ তাদের ভবিষ্যত। একই লক্ষ্যে জনপদ জুড়ে তৈরি করা হয়েছে বিভক্তি আর বিভক্তি। বিস্তার ঘটানো হয়েছে দুর্নীতি-লোভ আর লালসার অবাধ রাজত্ব। ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে মানুষের সং-বদ্ধতাকে। জনগণের পাটফর্মকে করা হয়েছে ভয়ঙ্করভাবে বিদ্ধস্ত।

আর এই এজেন্ডার মধ্যদিয়ে সামরিক জান্তা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে শোষক এবং সাম্রাজ্যবাদীদের আরেক দোসর মৌলবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল আর '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী-রাজাকার-আলবদর-জামায়াতীচক্রকে। জেনারেল জিয়া এজন্য '৭১-এর যুদ্ধাপরাধ সংক্রান্ত দালাল আইন বাতিল করেছে, এদের ভোটাধিকার ও রাজনীতি করার অধিকার দিয়েছে, নিজে নতুল দল বানিয়ে তাতে এদের অন্তর্ভূক্ত করেছে। করেছে সমরজান্তার অংশীদার। জিয়ার নতুন দলে '৭১-এর যুদ্ধপরাধী-মৌলবাদীচক্র ছাড়াও যুক্ত হয়েছে মওলানা ভাসানীর অনুসারীসহ বামপন্থী বলে পরিচিত একশ্রেণীর রাজনীতিকরাও।

এছাড়া এই প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত '৭২-এর সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে, সংবিধান থেকে অসাম্প্রদায়িকতা এবং প্রগতিশীলতাকে বাতিল করা হয়েছে। এরপরই বহুদলীয় গণতন্ত্র চালুর নামে এক নতুন লক্ষ্যকে সামনে রেখে সামরিক শাসন তুলে নেওয়া হয়েছে।

বিনুরা আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করেছে। কর্নেল তাহেরসহ ওদের অন্তত ১০ হাজার কমরেডকে হত্যা করা হলেও মূল নেতা হিসেবে রহস্যময় 'দাদা' রহস্যই থেকে গেছেন। তিনি আছেন বহাল তবিয়তে। কিছুদিনের জন্য তাকে জেলের ভিতরে সুরক্ষায় রাখা হলেও ফের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি এমনসব কাজ করছেন যাতে অনেক রহস্যই উন্মোচন হয়ে পড়ছে। তারসঙ্গে আগে থেকেই যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংযোগ ছিল– তা একেবারেই খোলাশা হয়ে গেছে। বিনুদের বিপর্যয়ের কারণটা কি তাহলে এখানেই?

(এগারো)

একটি মাটির বাড়ি। দেওয়ালে মোটা বালিশে পিঠ রেখে আধা শোয়া বিনু। উদাস চেয়ে আছে। পা দুটো লম্বা। অনেকটা ছড়ানো। ডান পাশে ম্যাগজিন ভর্তি বুলেটসহ একটি স্টেনগান। আরেক পাশে বুলেট ভর্তি আরো দুটো অতিরিক্ত ম্যাগজিন।

বিনু গুরুতর আহত। তাই শয্যাশায়ী। রয়েছে একেবারেই নিজস্ব এবং পার্টিসহ সকলের অজ্ঞাত এক গ্রামীণ সেল্টারে। গত ৩ বছরে ও অনেকবার রেইড, অ্যাম্বুশ এবং গানফায়ারের মুখে পড়েছে। এগুলো হয়েছে সামরিক বাহিনী, পুলিশ, প্রতিপক্ষ আন্ডারগ্রাউন্ড চরমপন্থী বিভিন্ন গ্রুপ এবং নিজেদের উপদল থেকে। এতোকিছুর পরে আজও প্রাণে বেঁচে আছে ও গুরুতর আহত হয়ে। পুলিশ এবং সরকারী বাহিনীর রেইডে পড়েছিল ও। সঙ্গে আরো তিন কমরেড ছিল। প্রত্যেকে সশস্ত্র থাকলেও পর্যাপ্ত বুলেট ছিল না। ফলে গোলাগুলির এক পর্যায়ে এসএমজি এবং কাটা-রাইফেলের বুলেট শেষ হয়ে যায়। তখন সরকারী বাহিনীর বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তিন কমরেড। বিনু'র শরীরে বিদ্ধ হয় আধা ডজন বুলেট। রাতের বেলায় এক সেল্টারে এই রেইডের ঘটনা ঘটেছিল বলে বিনু অল্পের জন্য ধরা পড়েনি। আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। তখন গড়িয়ে সেল্টার থেকে পাশের এক খাঁদে পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে এক সেল্টারদাতা ওকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসে। ওরসঙ্গে যে রিভলবারটা ছিল– সেটা হারিয়ে গেছে। পরে ওটা সরকারী বাহিনী পেয়ে যায়। বিনু শুনেছে, ওর সঙ্গে যে কমরেডরা গুলিবিদ্ধ হয়েছিল– তাদের দু'জন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়, একজন অজ্ঞান অবস্থায় মারা যায় হাসপাতালে। ওদের

অস্ত্রগুলো সরকারী বাহিনীর কব্জায় চলে যায়। এই অবস্থায় বিনু এখন সেল্টারে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। এ সেল্টারের কথা অন্য কেও জানে না। জানে শুধু একজন। সে হলো রিতু।

এরমধ্যে বিনুর চোখের সামনে ঘটে গেছে আরো অনেক ঘটনা। ওর পার্টি হঠাৎ বিপ্লবী গণবাহিনী এবং বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ভেঙে দিয়েছে। বিনুর বিশ্বাস কাজটি আসলে পার্টি করেনি। করেছেন সেই রহস্যময় ব্যক্তি 'দাদা'। কাজটা করে পার্টিতে সবচেয়ে বড় ধসটি নামিয়ে দেওয়া হয়। পার্টি ভেঙে কয়েক টুকরো হয়েছে। পার্টির সামরিক শক্তি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। এই শক্তি এখন একে অপরের প্রতিপক্ষ। এই শক্তির কোনটা বিপথে চলে গেছে, কোনটা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, কোনটা অন্য দলে চলে গেছে, কোনটা সরকারী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেছে। রহস্যময় ব্যক্তিটির মাধ্যম থেকে এখন পার্টির এই সামরিক শক্তিকে শোষক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতার উৎস সামরিক শাসকবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আকার-ইঙ্গিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। তুলে না দিলে শাসকবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরইমধ্যে পার্টির সকল সেল্টারসহ সামরিক শক্তির যাবতীয় তথ্য তুলে দেওয়া হয়েছে এই বাহিনীর গোয়েন্দা শাখায়। ফলে এখন চলছে নতুন কায়দায় সরকারী অভিযান। এতে করে পার্টি-সংগঠনের তাবৎ নেটওয়ার্ক এবং সাংগঠনিক ভিত্তি একরকম ধ্বংস হয়ে গেছে। ভয়াবহ অন্তর্ঘাতের শিকার হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে পার্টি, পার্টি সংগঠন-গণসংগঠন, সামজিক বিপবের শক্তিভিত এবং মুক্তিযুদ্ধের মতাদর্শের সংগ্রাম ও লড়াই। রাষ্ট্রীয় বন্দুক পরিপূর্ণভাবে শত্রুশক্তির কব্জায় চলে গেছে।

বিনু সরকারী বাহিনীর হাতে নিজেদের সামরিক শক্তি তুলে দেয়নি, দিতেও রাজী নয়। ও ওর ঘনিষ্ঠ কমরেডদের মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারও করে দিয়েছে। ফলে এখন বিনু পার্টির ভিতরেও অন্ত র্ঘাতিদের টার্গেটে। এ অবস্থায় বিনু নিজের প্রয়োজনে স্টেনগানটাকে সঙ্গে রেখেছে, আর ওর সাহায্য-সহযোগী হিসেবে রিতুকে দিয়েছে পয়েন্ট ৩৭ ক্যালিবারের চাইনিজ লামা পিস্তলটি। যদিও কোনভাবেই ওটা নিতে চায়নি রিতু। তারপরেও অনেক যুক্তি-তর্কের পর রাজী হয়েছে।

'বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতা উৎস'– কমরেড মাও সে তুংয়ের এই কথাটা স্মরণ করছিল ও। নিজের মতো করে ভাবছিল– এই নল যার হাতে, ক্ষমতা থাকে তার হাতে। এ নল যদি ধনিক শ্রেণী বা শোষকগোষ্ঠীর কব্জায়, অথবা পুঁজিবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের কব্জায় থাকে– তাহলে ক্ষমতাও থাকে তাদের হাতে। এ ক্ষেত্রে জনগণ হয় তাদের টার্গেট, হয় ক্ষমতাহীন। রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশের বন্দুক কার কব্জায়? জনগণের কব্জায় কি? না। এ বন্দুক জনগণের কব্জায় নেই। সে কারণেই জনগণ এই বন্দুকেরই টার্গেট। সুতরাং এখান থেকে মুক্তি প্রয়োজন। এই মুক্তির জন্যই ১৯৭১-এ এদেশের জনগণ বন্দুক নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। তখন রাষ্ট্রীয় বন্দুক যাদের হাতে ছিল, তাদেরকে বিদ্রোহে সামীল করে জনগণের পক্ষে টেনে আনা হয়েছিল। সবাই তখন জনগণ হয়ে গিয়েছিল বলেই– রচিত হয়েছিল মহান জনযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ। আর এই যুদ্ধই এনে দিয়েছিল মহান বিজয়, গৌরবের বাংলাদেশ। কিন্তু তারপর? তারপর যুদ্ধের কোন প্রত্যাশাই পূরণ হয়নি। বন্দুক বা 'সকল ক্ষমতার উৎস'কে যে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল– শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। হয়নি বলেই জায়গাটি সেই পুরনো পাকিস্তানি আদলেই থেকে গেছে। সে কারণে এ বন্দুক হামলে পড়েছে জনগণের উপর, হামলে পড়েছে জাতিরজনকসহ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী সকলের উপর, এবং হামলে পড়েছে জনযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের মতাদর্শের উপর। এজন্যই মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল (অব:) তাহেরকে সিপাহী-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মতো আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিতে হয়েছিল। বিনু বিশ্বাস করে, বাঙালি জাতির শোষণমুক্তি এবং তাঁদেরকে সত্যিকারের বিজয়ের গৌরবে অভিষিক্ত হবার জন্য এই বন্দুকের কব্জার বিষয়টি আগে ফয়সালা করতে হবে। ভেঙে দিতে হবে সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের শক্তিভিত। না হলে কখনই মুক্তি আসবে না। এ বন্দুক বারবার হামলে পড়বে গণমানুষের উপর, তাঁদের নেতৃত্বের উপর, এই মানুষের প্লাটফর্ম হিসেবে তাঁদের রাজনীতির উপর এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে পাওয়া সংবিধানের উপর। হামলে পড়বে গণতন্ত্র,

বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, শোষণমুক্তির চিন্তা-চেতনা এবং এই মতাদর্শের সমস্ত শক্তিভিতের উপর। যদিও এ বন্দুক সিপাহীদের হাতে, তারপরেও তাদের কিছুই করার নেই। কারণ তাদের শুধু হুকুমের দাসের মতোই চলতে হবে, তারা শুধু ব্যবহার হবে, কোন কথা বলার অধিকার থাকবে না তাদের। অতএব এখানে ফয়সালা ছাড়া পথ নেই, মুক্তি নেই।

বিনু নড়ে-চড়ে ওঠার চেষ্টা করলো। তীব্র যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। গোটা শরীরে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ব্যাথায় টনটনে অবস্থা। জামবাক এবং এন্টিসেপ্টিক লোশন ব্যবহার করেও কাজ হচ্ছে না। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। শরীর থেকে এখনও দুটো বুলেট বের করা সম্ভব হয়নি। বাকি বুলেটগুলো এফোর-ওফোর হয়ে বেরিয়ে গেছে। দুটি বুলেট ভেতরেই রয়ে গেছে। একটি পায়ে এবং আরেকটি বুকের বামে উপরের হাড়ে বিঁধেছে। এগুলো বের করে ভাল চিকিৎসার জন্য অপারেশন থিয়েটার থাকা উন্নত কোন চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তাই শরীরের ভেতর ক্ষত বাড়ছে, হয়তো গ্যাংগ্রিন ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। রিতু বার বার করে ওকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু রাজী হয়নি। কারণ বেরুলেই ধরা পড়তে হবে। বিনু নিশ্চিত, ওর মুত্যু ঘনিয়ে আসছে। চিকিৎসার অভাবে এ মুত্যু ঘটবে। রিতুর চেষ্টায় সাধারণ ওষুধ আর কবিরাজী পথ্য দিয়ে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে ওকে। রিতু হয়তো শেষ পর্যন্ত ওকে এভাবে মরতে দিতে চাইবে না। জোর করেই কোন আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাবে। কিন্তু জীবিত অবস্থায় ধরা পড়ার কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ বিনু।

টেবিলে একটা ঘড়ি চলছে। সময় সকাল ৯টা বেজে ২২ মিনিট। সেল্টারদাতার স্ত্রী এরইমধ্যে বিনুকে তরল খাবার খাইয়ে গেছে। গোটা শরীরে এমন ব্যাথা যে শক্ত কিছু খাবার মতো অবস্থা নেই। ব্যান্ডেজ বাঁধা পা-টা একটু নড়ানোর চেষ্টা করলো। সাহায্যের জন্য ডান হাত ব্যবহার করলো। অসহ্য যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে সামান্য একটু নড়ানো সম্ভব হলো। নিচে একটা নরম বালিশ। সেটার ওপরই ফের আস্তে করে পা-টা রাখলো। আসলে একভাবে থাকতে থাকতে ঝিম ধরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে না নড়ালে কাজ হচ্ছে না। তাছাড়া পা এবং হাতচলনসই করতে না পারলে ওর পক্ষে দরকারের সময় স্টেনও ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। সাধ্যমত তাই চেষ্টা করছে এ দুটো অঙ্গকে ব্যবহার উপযোগী করার।

১০টার মধ্যে রিতুর চলে আসার কথা। ওকেও এখন সেল্টারে সেল্টারে থাকতে হচ্ছে। এরমধ্যে ওর বাবা মারা গেছেন। জেলে ছিলেন তিনি। এসময় অনেক রাজনীতিকের মতো তাৎক্ষণিক মুক্তির শর্তে তাঁকেও জেনারেল জিয়ার নতুন দল বিএনপিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাৎক্ষণিকই নাকচ করে দিয়েছিলেন রিতুর বাবা। ফলে আরো বেশী সময় জেলে থাকতে হয় তাঁকে। অসুস্থতার ব্যাপারে তেমন কোন চিকিৎসা দেওয়া হয়নি সেখানে। ফলে বিপদ বেড়ে যায়। অবশ্য তিনি শেষ মুহূর্তে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন, কিন্তু রোগ এবং বার্ধক্য তাঁকে ছড়েনি। তাঁর মৃত্যুর পর পরই মা-ও মারা যান শোকে-দুঃখে। সবচেয়ে বড় কথা রিতুদের পরিবারের উপর সামরিক সরকারের দমন-পীড়ন তো কম যায়নি। একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়েছে গোটা পরিবারকে। তাই সব হারিয়ে রিতুরা এখন সর্বস্বহারা। এ অবস্থায় পরিবারের আরেক সদস্য ছোট বোন ইতু'র জন্য জীবনটা হয়ে দাঁড়ায় আরো ভয়াবহ। একদিকে রিতুর খোঁজে পুলিশ-রাজাকার-আলবদর এবং জেনারেল জিয়ার নতুন দলের লোকজন যেভাবে পিছে লেগেছিল– তাতে ওকে রাজনৈতিক সেল্টারে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ফলে বাড়িতে একা ইতু'র নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। বাধ্য হয়ে ওকে কলকাতায় আত্মীয় বাড়ি পাঠাতে হয়েছে। আর রিতু স্বাভাবিকভাবেই বিনুর সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল।

রিতুকে নিয়ে এখন খুব বেশী চিন্তিত বিনু। নিজের মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিলেও রিতুর ব্যাপারে এমনটি ভাবতে পারছে না। এর অবশ্য একটা বড় কারণ আছে। কারণ, রিতুর গর্ভে বিনু'র সন্তান। দু'চার দিনের মধ্যেই ও মা হবে। সুতরাং সময়টা সন্ধীক্ষণের। বিনু-রিতু'র মধ্যে সামাজিক নিয়ম মেনে

বিয়ে হয়নি। রাজনৈতিক আদর্শকে সাক্ষী করে ওরা বিয়ে করেছে। এই অবস্থায় নিজের চেয়ে রিতুর জন্য বেশী চিন্তিত বিনু। যদিও বার বার করে রিতুকে সাবধানে চলতে বলেছে। দু'জন এক সেল্টারে থাকা ঠিক নয় ভেবে ওকে পাশের আরেক সেল্টারে রাত কাটাতে বলেছে। ওই সেল্টারে সেবা-যত্নের সুবিধা থাকায় অনেকটা স্বস্তিতে আছে বিনু। কিন্তু প্রতিদিন বিনুকে দেখা এবং সেবা করার জন্য রিতু ঝুঁকি নিয়ে হলেও আসবেই, এখানে কোন কথা শোনানো যাচ্ছে না ওকে। অথচ সামরিক বাহিনীর দোসর হিসেবে কাজ করছে কয়েকজন রাজাকার-আলবদর কমান্ডার। এরা যে কোন সময় ওদের অবস্থান জেনে যেতে পারে।

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে বিনু। ভাবছিল ওর জীবনের কথা। একদিন লেখা-পড়া, বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে যোগ দিয়েছিল বিপবের এই সংগ্রামে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুবর্ণ সুযোগগুলো শুধু ও একা ত্যাগ করেনি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই সংগ্রামে সামীল হয়েছিল ব্যক্তিগত সকল উচ্চাশা ত্যাগ করে। পার্টি বলেছিল, 'বুর্জোয়া শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই, আমরা খুব দ্রুত বিপ্লব করবো, নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম করবো, যেখানে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় বুর্জোয়া শিক্ষার মতো শুধু সার্টিফিকেট আর চাকরি'র লক্ষ্যটি থাকবে না। সেখানে থাকবে মানুষ, দেশ এবং উভয় ক্ষেত্রের জন্যই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্য এবং কাজ। আমরা পালন করবো মহান দায়িত্ব, যা আমাদের অতীত ইতিহাস, '৫২'-৬২'-'৬৮-'৬৯-'৭০ এবং '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশাকে পূরণ করবে। একটি জীবনের জন্য এরচাইতে বড় পাওয়া এবং অর্জন আর কী হতে পারে? কিছুই হতে পারে না। সুতরাং আমরা প্রচলিত সকল ধারা থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন জীবনব্যবস্থা তথা সমাজ বিনির্মাণ করবো, যেখানে আজকের মতো কোন শ্রেণীভেদ, শ্রেণীবৈষম্য থাকবে না। সমাজ বিকাশের ধারায় বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর নতুন আরেক মাইলফলক।' বিনু মনে ভেবেছে, সত্যিই তো– সমস্যা আসলে রাজনৈতিক। এখানে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-জজ-ব্যারিস্টার হয়ে লাভ নেই। এগুলো ব্যক্তিগত সুবিধা দিতে পারে ঠিক, কিন্তু সমস্যার মূলে কিছুই করবে না, বরং মূলটাকে বাঁচিয়ে রেখে সমস্যাকে শুধু বাড়াবেই আর বাড়াবে। সুতরাং চিকিৎসা প্রয়োজন গোড়ায়, যার চিকিৎসক হলো রাজনীতি। এই রাজনীতিই পারে কেবল সমাজবিপ্লব করতে, পারে শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে গুড়িয়ে দিতে।

(বারো)

বিনু ভাবছিল, বিপ্লবের জন্য উর্বরক্ষেত্র তৈরি করেছিল ওরা। আর কিছুটা সময় পেলেই সফল হতে পারতো। কিন্তু গভীর ষড়যন্ত্র এবং অন্তর্ঘাত সর্বনাশ করে দিয়েছে। এমন কি অনুকূল ভবিষ্যতটাকেও ওরা ধুলিস্যাৎ করে দিতে চাইছে। বিপবের উল্টো ধারায় নিয়ে যেতে চাইছে সবকিছুকে। বিনু'র এখন বিশ্বাস হচ্ছে, '৭১-এর সু-মহান জনযুদ্ধের পর বিনুরা যা করতে চেয়েছিল, তা আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। বিনুরা তেমন কিছুই করে যেতে পারছে না। গভীর হতাশায় কুঁকরে গেল ও। সত্যিই কি কিছুই দিয়ে যেতে পারছে না ওরা? এতো আত্মত্যাগ, রক্তদান, জেল-জুলম-নির্যাতন ভোগ, জীবন বিসর্জন– সবই কি বৃথা হয়ে গেল? আর ভাবতে পারছে না বিনু। মাথা নিচু করে কাঁপতে লাগলো ও।

বেশ অনেক্ষণ ডুকরে ডুকরে কাঁদলো। তারপর আস্তে আস্তে নিজের সত্ত্বায় ফিরে আসার চেষ্টা করলো। নিজেকে প্রশ্ন করলো, সত্যিই কি এতো আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে? কেন যেন মনে হলো, এটা হতেই পারে না। আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। এক একটি আত্মত্যাগ ভবিষ্যতের যাত্রাপথকে সঠিকভাবে চিনিয়ে দেয়, পথকে আরো সুগম করে দেয়। আত্মত্যাগে কারো ক্ষতি হয় ঠিক, কিন্তু সমষ্টির জন্য তা হয় পাথেয়। এই জায়গাটায়ই বিনু স্বস্তি পেতে চায়। হ্যাঁ, ও এবং ওর পার্টির কমরেডরা অনেক আত্মত্যাগ করেছে, কিন্তু প্রত্যাশিত সময়ে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও– চলার পথ, পথের শত্রু, ষড়যন্ত্র এবং অন্ত

ঘাতিদের চিনিয়ে দিতে পেরেছে। এ থেকে ভবিষ্যত লড়াকুদের পথ সুগম হবে। এ পথ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের বিজয়কে নিষ্কণ্টক করবে। বিপ্লব হবে দীর্ঘজীবী। নিশ্চয়ই হবে, হতেই হবে।

বাইরে হঠাৎ ঝটপট শব্দে সম্বিত ফিরে পেল বিনু। পুরো স্বাভাবিক হবার আগেই দড়াম করে কাঠের দরজা খুলে গেল। সেখানে উদ্ভ্রান্ত দাঁড়িয়ে রিতু। অপেক্ষা না করে ভিতরে ঢুকে পড়লো এবং হরবর করে যা বললো তাতে থ হয়ে গেল বিনু। রিতু বললো, ওই চিহ্নিত রাজাকার-আলবদর কমাণ্ডাররা সব খবর পেয়ে গেছে। ওরা সাদা পোশাকের সশস্ত্র লোক ডেকে এনেছে। এলাকা ঘিরে ফেলেছে ওরা। পালাতে হবে। 'এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়' বলে বিনুকে তুলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো রিতু। বিনু হাত তুলে বাধা দিলো। ডান হাতে স্টেন তুলে নিলো। বললো, পালাবার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি চলে যাও। এক্ষুণি চলে যাও। আমি ওদের উচিত শিক্ষা দিচ্ছি।

কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে আবারও এগিয়ে গেল রিতু। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের শক্ত ঝটকায় সড়ে আসতে হলো। বিনু কঠোর দৃষ্টিতে রিতুর চোখে চোখ রেখে বললো, এটা আবেগের সময় নয়। আমাকে নিয়ে কোনভাবেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না। আমি সুস্থ হলে কথা ছিল। আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করার অর্থ হবে, দু'জনেরই একসঙ্গে মৃত্যু। স্মরণ করো, শুধু দু'জন নয়। যাকে নিয়ে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখছি, নতুন ভবিষ্যতের আশা করছি– সেই স্বপ্ন এবং আশারও মৃত্যু হবে। তুমি কি চাও সব শেষ হয়ে যাক?

হতবিহ্বল রিতু মাথা নাড়লো। বিনু বললো, সুতরাং ভবিষ্যতকে বাঁচাতে হবে, তোমাকেও বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। আর আমি! আমি তো মৃত্যুর ৯৯ ভাগ পূর্ণ করেই আছি। তাহলে ভাবনা কিসের? যাও, দ্রুত চলে যাও ওরা এখানে এগিয়ে আসার আগেই।

ঠিক তখনই বাইরে থেকে 'হল্ট' বলে কেও চিৎকার করে উঠলো। সাদা পোশাকের লোকেরা হালকা মেশিনগান বাগিয়ে মাটির ঘরটির দিকে এগিয়ে আসছে। বিনু আবারও কঠোর চোখে রিতুর দিকে তাকালো। রিতু যেন সম্বিত ফিরে পেল। ওর দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো জলের ধারা। বিনুর ইশারায় তারপরেও ঘুরে দাঁড়ালো রিতু, এবং এগিয়ে গেল আরেকটি দরজার দিকে। বিনু শেষ শব্দটি উচ্চারণ করলো, লং লিভ রেভ্যুলুশন। আমি কভার করছি রিতু, তুমি এগিয়ে যাও।

রিতু আস্তে করে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতেই একঝাঁক গুলিবৃষ্টি হলো। বিনুর মনে হলো রিতুর ওপরই চালানো হয়েছে। কঠোর হয়ে উঠলো ওর চোয়াল। ঠিক তখনই ওর অবস্থান লক্ষ্য করে আরেক ঝাঁক বুলেট ছুটে এলো এবং পাশের জানালা-কবাট ছিটকে খুলে পড়লো। স্টেনের সেফটি ক্যাচে সিঙ্গল-সট ওপেন করে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে লক্ষ্য করলো বিনু। ডানহাতে স্টেনের নল টার্গেটে স্থাপন করলো। নলের রেখায় পড়লো এগিয়ে আসতে থাকা এক পিস্তলধারীর মাথা। ট্রিগারে সঙ্গে সঙ্গে চাপ দিলো। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠলো বদ্ধ ঘর। অন্যদিকে লুটিয়ে পড়লো পিস্তলধারী। তার সঙ্গীরা কালবিলম্ব না করে মাটিতে শুয়ে পড়লো। এবার বিনু সেফটি ক্যাচে অটো-সট ওপেন করলো এবং সাদা পোশাকধারীদের ওপর এক পশলা বুলেট ছুঁড়ে দিলো। বেশ কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অবশ্য বাকি কয়েকজনের সাব-মেশিনগান থেকে ধেয়ে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট। এসব লুফে নিলো মাটির দেওয়াল। ভাঙা জানালায়ও কয়েকটি বুলেট আঘাত করলো। ঝটকায় জানালার পাশটা খুলে পড়লো। বিনুও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দিলো। মনে মনে বললো, পুরো তিনটি ম্যাগজিন ভর্তি বুলেট রয়েছে তোমাদের জন্য। সেইসঙ্গে চেষ্টা করলো বিছানা থেকে নেমে পড়তে। কিন্তু বুলেটবিদ্ধ পা সহায় হলো না। দেহও সায় দিলো না। উত্তেজনায় বিনু অবশ্য ভুলে গেল প্রচণ্ড যন্ত্রণার কথা। জানালা দিয়ে আবার এক ঝাঁক বুলেট ঢুকে দেওয়ালের আরেক পাশে আঘাত করলো। ভেঙে চুরমার করে দিলো একটা কাঁচে বাঁধানো গ্রামীণ ওয়ালম্যাট। বিনু আবার লক্ষ্য করলো

বাইরে। হামলাকারীরা গা-ঢাকা দিয়েছে পাশের বাড়ি এবং গাছ-পালার আড়ালে। তবে একজনকে ওয়াকিটকি বের করে কথা বলতে দেখলো। লোকটির কপাল বরাবর টার্গেট করে ট্রিগার টিপে দিলো বিনু। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে স্থির হয়ে গেল টার্গেট। আরেক পাশ থেকে আবারও এক ঝাঁক বুলেটের পাল্টা জবাব এলো বিনুর দিকে। তারপর স্থির হয়ে গেল। সুনসান হয়ে গেল সব। কিছু সময় কোন শব্দ থাকলো না গোলাগুলির।

মিনিটখানেক পর হ্যান্ড মাইক বেজে উঠলো বাইরে। কেও বললো, 'বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলা হয়েছে। গুলি করবেন না, আত্মসমর্পন করুন'। কয়েক দফা একই কথা বলা হলো। নিরবতা ভঙ্গ করলো বিনু ওর স্টেন থেকে এক পশলা বুলেট ছুঁড়ে দিয়ে। জানিয়ে দিলো আত্মসমর্পনের কোন ইচ্ছে ওর নেই। লড়েই মরবে ও। এতেকরে সব চুপচাপ হয়ে গেল আবার। বিনু বুঝলো, নতুন কৌশলে এবার হামলা হবে। কিন্ত ওরপক্ষে কিছুই করার নেই। সুস্থ থাকলে দেখিয়ে দিতে পারতো কৌশল কাকে বলে। কিন্তু এখন ও অসহায়, নিরুপায়।

অন্তত পাঁচ মিনিট কেটে গেল। গ্রামবাসীর চিৎকার-আহাজারি এবং গুঞ্জন ছাড়া কোন সারাশব্দ নেই। বিনু একটু সড়ে এসে দেওয়ালে বালিশটি রাখলো। পিঠ এলিয়ে দিলো। তারপর স্টেনে নতুন আরেকটি ম্যাগজিন ভরে দরজা বরাবর টার্গেট করলো। অপেক্ষায় থাকলো শত্রুর। মনে মনে বললো, প্রতিক্রিয়াশীলচক্র ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদের দোসররা ধ্বংস হোক, দালালরা নিপাত যাক, সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, লং লীভ রেভ্যুলিউশন, জয় হোক মেহনতি মানুষের।

বাঁ-হাতের দেওয়াল ফুটো করে একটি নল বেরিয়ে এলো এবং লক্ষ্যহীনভাবে এক পশলা গুলি ছুঁড়লো। কোন জবাব দিলো না বিনু। ওদিকে গুলি ছুঁড়েই হামলাকারী নল বের করে নিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বিনু ওই দেওয়াল লক্ষ্য করে পুরো এক ডজন বুলেট বৃষ্টি ছুঁড়লো। ওপাশে বেশ কয়েকজন আর্তচিৎকার করে উঠলো। ঠিক তখনই ডান দিক থেকে একইভাবে দেওয়াল ফুটো করে একটি এসএলআর-এর নল ঢুকে বুলেট নিক্ষেপ করলো বিনুর অনেকটা বাম দিকে। জবাবে ওই নল লক্ষ্য করে আরও এক ঝাঁক বুলেট ছুঁড়ে দিলো। এবারও আর্তচিৎকার করে উঠলো একজন। বিনুর পিছন দিকের দেওয়ালে ব্রাশ ফায়ার করলো শত্রুপক্ষ। কিন্তু পিছনটা শক্ত কাঠের আস্তরণে মাটির মোটা দেওয়াল থাকায় কোন কাজ হলো না। বিনু ভাবলো, এভাবে এলোপাথারি জবাব না দিয়ে প্রতিটি বুলেটের হিসেব করে শত্রুকে শায়েস্তা করতে হবে। সে কারণে জবাব দেওয়া বন্ধ করলো ও। অন্যদিকে শত্রুপক্ষও নিরব হলো আবার।

বিনু অনেক কষ্টে খাট থেকে গড়িয়ে পড়লো নিচে। প্রচণ্ড ব্যাথাকে পাত্তা না দিয়ে গড়িয়ে চলে এলো মূল দরজার কাছাকাছি। ফুটো দিয়ে দেখলো, জটলা করছে সাব-মেশিনগানধারী কয়েকজন। ওদের টার্গেট করে ট্রিগার টিপলো। তারপর আরও খানিকটা এগিয়ে স্টেনের ব্যারেল ভাল করে বাইরে তাক করলো। ওপাশ থেকে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এলো এবং এর অন্তত দুটি বিদ্ধ হলো বিনুর ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতে। যন্ত্রণাকে পাত্তা না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওই লক্ষ্য বরারর ব্রাশ করলো। আর্তচিৎকার ছড়িয়ে পড়লো। পিছন দিক থেকে এক ঝাঁক বুলেট বিদ্ধ করলো বিনুকে। অনেক কষ্টে ব্যারেল ঘুরিয়ে পাল্টা জবাব দিলো ও। তখনই ম্যাগজিন শূন্য হয়ে গেল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিনুর গোটা শরীর। চেষ্টা করলো স্টেনের ম্যাগজিন খুলে ফেলতে। একহাতে কষ্ট হলো। কিন্তু ম্যাগজিন রিলিজ করতে পারলো। অন্য ম্যাগজিনটি কোমরে রেখেছিল। সেটা বের করলো। তখনই ওর সামনে চাইনিজ টমিগান হাতে একজন এগিয়ে এলো এবং গোটা ম্যাগজিন শেষ করলো ওর বুক বরাবর। ছিন্নভিন্ন দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হলো বিনু।

(তেরো)

বিনুকে হত্যার দৃশ্যটি নিজের চোখে দেখলো রিতু। ও আরেক ঘরে অনেক শিশু-নারী-পুরুষের ভেতর। এরা সবাই একে অপরকে জড়িয়ে আহাজারি করছে। এদের মাঝেই রিতু। বিনুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পেছনের দরজা খুলে এক লাফে এ ঘরে ঢুকে পড়েছিল ও। ঠিক তখনই ওকে লক্ষ্য করে শত্রুপক্ষের এক ঝাঁক বুলেট ছুটে আসে। কিন্তু গুলিবিদ্ধ হবার আগেই ভেতরে চলে আসে ও। অল্পের জন্য রক্ষা পায় রিতু। কিন্তু এখন দেখতে পেলো কীভাবে ওর স্বামী বিনুকে একজন টমিগানধারী ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করলো, আর মাটিতে লুটিয়ে পড়লো বিনুর রক্তাক্ত দেহ।

শক্ত পাথর হয়ে কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে থাকলো রিতু। তারপর বিদ্যুৎ গতিতে কোমর থেকে বের করে আনলো পিস্তল। ঘাতক টমিগানধারী কয়েক গজ দূরে সামনের উঠোনে দাঁত বের করে হাসছে। লোকটার খুলি বরাবর টার্গেক করলো রিতু, সঙ্গে সঙ্গে টিপে দিলো ট্রিগার। মনে হলো ঘাতকের মাথাটা বিস্ফোরিত হলো, মগজ ছড়িয়ে পড়লো সামনের উঠোন বরাবর। এরপর আস্তে করে দেহটি বিনুর পাশেই ধপাশ পড়ে দাপাতে লাগলো । এর কয়েক সেকেন্ড পরই ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে এলো শত্রুপক্ষের তরফ থেকে। গুলিতে নারী-শিশুদের অনেকে হতাহত হলো। রিতু সামনে এগিয়ে এসে শত্রুদের লক্ষ্য করে কোন বিরতি না দিয়ে ট্রিগার টিপে চললো পাগলের মতো। বুলেটে ধরাশায়ী হলো প্রতিপক্ষের বেশ কয়েকজন। কিন্তু পাশ থেকে এক সাব-মেশিনগানধারীর ব্রাশ ফায়ারে রিতুর মুখমণ্ডল, গলা এবং পাজর এফার-ওফোর হয়ে গেল। লুটিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত রিতু ঘাতকটিকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে যেতে থাকলো। দুটো বুলেট আঘাত করলো ঘাতককে। তার হৃৎপিণ্ড এবং কানের এপাশ দিয়ে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট।

তারপর সব শেষ। ইতস্তত কিছু গুলির শব্দ হলো এবং তারপর হঠাৎ করেই সব থেমে গেল। নেমে এলো গভীর নিরবতা।

(চোদ্দ)

হাসপাতাল। সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে বিদীর্ণ চারপাশ। শিশুটির পাশেই রক্তাক্ত মা রিতু। ওদের বেডের দু'পাশে অনেক মানুষ। এরমধ্যে ডাক্তার-নার্স ছাড়াও রয়েছে পুলিশ, গ্রামের নারী-পুরুষ এবং শিশুরা। সবাই নির্বাক। শুধু চিৎকার করে চলেছে একটি শিশু। চিৎকারের মর্মবাণীতে কিছু ছিল। ডাক্তার এগিয়ে এসে আলতো করে রিতুর মাথায় হাত রাখলো। এখনও প্রাণপ্রদীপ নিভে যায়নি ওর। হঠাৎ চোখের পাতা কেঁপে উঠলো। আস্তে আস্তে রিতুর চোখের পাতা সামান্য ফাঁক হলো। দৃষ্টি চলে গেল ক্রন্দনরত শিশুর দিকে। ঠোঁটটা একটু নড়লো, যেন হাসতে চেষ্টা করলো। তারপর গ্রাম্য শিশুদের ওপর স্থির হলো চোখের মনি। ওভাবে স্থির হয়েই থাকলো। ডাক্তার বললেন, শি ইজ নাউ ডেড।

– সমাপ্ত –

- লেখক : আবুল হোসেন খোকন
- ই-মেইল : ahkhokon@gmail.com